মানুষের ধর্ম্ম

কমলা দেবী

The Kamala Lectures

মানুষের ধর্ম্ম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৩৩
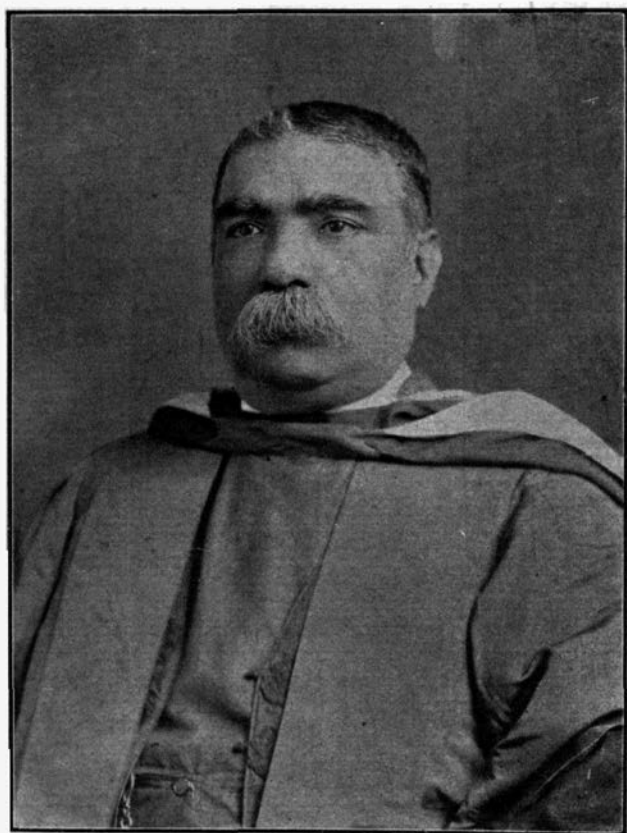
FOUNDER'S LETTER

77, RUSSA ROAD NORTH,
BHOWANIPORE,
CALCUTTA
9th February, 1924

TO

THE REGISTRAR,
CALCUTTA UNIVERSITY

SIR,

I desire to place at the disposal of my University Government Securities for Rupees Forty Thousand only of the 3 per cent. Loan with a view to establish a lectureship, to be called the *Kamala Lectureship*, in memory of my beloved daughter Kamala (*b.* 18th April, 1895—*d.* 4th January, 1923). The Lecturer, who will be annually appointed by the Senate, will deliver a course of not less than three lectures, either in Bengali or in English, on some aspect of Indian Life and Thought,

the subject to be treated from a comparative standpoint.

The following scheme shall be adopted for the lectureship :

(1) Not later than the 31st March every year, a Special Committee of five members shall be constituted as follows :

One member of the Faculty of Arts to be nominated by the Faculty.
One member of the Faculty of Science to be nominated by the Faculty.
One member to be nominated by the Council of the Asiatic Society of Bengal.
One member to be nominated by the Bangiya Sahitya Parisad.
One member to be nominated by the Founder or his representatives.

(2) The Special Committee, after such enquiry as they may deem necessary, shall not later than the 30th June, draw up a report recommending to the Senate the name of the distinguished scholar. The report shall specify

the subject of the proposed lectures and shall include a brief statement of their scope.

(3) The report of the Special Committee shall be forwarded to the Syndicate in order that it may be laid before the Senate for confirmation not later than the 31st July.

(4) The Senate may for specified reasons request the Special Committee to reconsider their decision but shall not be competent to substitute another name for the one recommended by the Committee.

(5) The Lecturer appointed by the Senate shall deliver the lectures at the Senate House not later than the month of January next following.

(6) The Syndicate shall, after the lectures are delivered in Calcutta, arrange to have them delivered in the original or in a modified form in at least one place out of Calcutta, and shall for this purpose pay such travelling allowance as may be necessary.

(7) The honorarium of the Lecturer shall consist of a sum of Rupees One Thousand in cash and a Gold Medal of the value of Rupees Two Hundred only. The honorarium shall be paid only after the lectures have been delivered and the Lecturer has made over to the Registrar a complete copy of the lectures in a form ready for publication.

(8) The lectures shall be published by the University within six months of their delivery and after defraying the cost of publication the surplus sale proceeds shall be paid to the Lecturer, in whom the copyright of the lectures shall vest.

(9) No person, who has once been appointed a Lecturer shall be eligible for re-appointment before the lapse of five years.

Yours faithfully,

ASUTOSH MOOKERJEE.

ভূমিকা

মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবযাত্রা-নির্ব্বাহে তার জ্ঞান তার কর্ম্ম তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।

কিন্তু মানুষের আর একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি, তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু সেই অমরতা। সেখানে বর্ত্তমান কালের জন্যে বস্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত-প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম্ম স্বার্থের প্রবর্ত্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে, আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে-বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।

স্বার্থ আমাদের যে-সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম্ম।

কোন্ মানুষের ধর্ম্ম? এতে কার পাই পরিচয়? এ তো সাধারণ মানুষের ধর্ম্ম নয়, তাহলে এর জন্যে সাধনা করতে হোত না।

আমাদের অন্তরে এমন কে আচেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম ক'রে "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।" তিনি সর্ব্বজনীন সর্ব্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্ম্মে সর্ব্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীব-সীমা অতিক্রম ক'রে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষের উপলব্ধি সর্ব্বত্র সমান নয় ও অনেক স্থলে বিকৃত ব'লেই সব মানুষ আজও মানুষ হয়নি। কিন্তু তাঁর আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করচে ব'লেই আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করচে না। সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেচে, তাঁকেই বলেচে "এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা।" সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা ক'রে তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েচে

স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

সেই মানব, সেই দেবতা, য একঃ, যিনি এক, তাঁর কথাই আমার এই বক্তৃতাগুলিতে আলোচনা করেছি।

শান্তিনিকেতন
১৮ই মাঘ, ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষের ধর্ম

পথ চলেছিল একটানা বাইরের দিকে, তার নিজের মধ্যে নিজের অর্থ ছিল না। পৌঁছল এসে ঘরে, সেখানে অর্থ পাওয়া গেল, আরম্ভ হোলো ভিতরের লীলা। মানুষে এসে পৌঁছল সৃষ্টিব্যাপার, কর্ম্মবিধির পরিবর্ত্তন ঘটল, অন্তরের দিকে বইল তার ধারা। অভিব্যক্তি চলছিল প্রধানত প্রাণীদের দেহকে নিয়ে, মানুষে এসে সেই প্রক্রিয়ার সমস্ত ঝোঁক পড়ল মনের দিকে। পূর্ব্বের থেকে মস্ত একটা পার্থক্য দেখা গেল। দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র; পৃথকভাবে আপন দেহরক্ষায় প্রবৃত্ত, তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা। মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ। তার সফলতা সহযোগিতায়। বুঝতে পারে বহুর মধ্যে সে এক, জানে তার নিজের মনের জানাকে বিশ্বমানব-মন যাচাই করে, প্রমাণিত করে, তবে তার মূল্য। দেখতে পায় জ্ঞানে কর্ম্মে ভাবে যতই সকলের সঙ্গে সে যুক্ত হয় ততই সে সত্য হয়। যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের সভ্যতা। তাই মানুষের সেই প্রকাশই

শ্রেষ্ঠ যা একান্ত ব্যক্তিগত মনের নয়, যাকে কালের সকল মানুষের মন স্বীকার করতে পারে। বুদ্ধির বর্ব্বরতা তাকেই বলে যা এমন মতকে এমন কর্ম্মকে সৃষ্টি করে যাতে বৃহৎকালে সর্ব্বজনীন মন আপনার সায় পায় না। এই সর্ব্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি করাতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি-সীমাকে পেরিয়ে বৃহৎমানুষ হয়ে উঠচে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎমানুষের সাধনা। এই বৃহৎ-মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।

ইতিহাসে দেখা যায় মানুষের আত্মোপলব্ধি বাহির থেকে অন্তরের দিকে আপনিই গিয়েচে যে-অন্তরের দিকে তার বিশ্বজনীনতা, যেখানে বস্তুর বেড়া পেরিয়ে সে পৌঁছেচে বিশ্বমানসলোকে; যে-লোকে তার বাণী, তার শ্রী, তার মুক্তি। সফলতালাভের জন্যে সে মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম্ম নিয়ে বাহ্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, অবশেষে সার্থকতালাভের জন্যে একদিন সে বললে, তপস্যা বাহ্যানুষ্ঠানে নয়, সত্যই তপস্যা; গীতার ভাষায় ঘোষণা করলে দ্রব্যময় যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়, খৃষ্টের বাণীতে শুনলে বাহ্য বিধিনিষেধে পবিত্রতা নয় পবিত্রতা চিত্তের নির্ম্মলতায়। তখন মানবের রুদ্ধমনে

বিশ্বমানবচিত্তের উদ্বোধন হোলো। এই তার আন্তর সত্তার বোধ দৈহিক সত্তার ভেদসীমা ছাড়িয়ে দেশে কালে সকল মানুষের মধ্যে ঐক্যের দিকে প্রসারিত। এই বোধেরই শেষ কথা এই যে, যে-মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে, সেই জানে সত্যকে।

মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর একটা বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে, জীব চলচে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে-সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দ্দেশ। কোন্‌দিকে নির্দ্দেশ? যেদিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যেদিকে তার পূর্ণতা, যেদিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেচে, যেদিকে বিশ্বমানব। ঋগ্‌বেদে সেই বিশ্বমানবের কথা বলেচেন,—

পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি
ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি,—

তাঁর এক চতুর্থাংশ আছে জীবজগতে, তাঁর বাকি বৃহৎ অংশ ঊর্দ্ধে অমৃতরূপে। মানুষ যেদিকে সেই

ক্ষুদ্র অংশগত আপনার উপস্থিতকে প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করে সত্য, সেইদিকে সে মৃত্যুহীন, সেইদিকে তার তপস্যা শ্রেষ্ঠকে আবিষ্কার করে। সেইদিক আছে তার অন্তরে, যেখান থেকে চিরকালের সকলের চিন্তাকে সে চিন্তিত করে, সকলের ইচ্ছাকে সে সফল করে, রূপদান করে সকলের আনন্দকে। যে-পরিমাণে তার গতি এর বিপরীত দিকে, বাহ্যিকতার দিকে, দেশকালগত সঙ্কীর্ণ পার্থক্যের দিকে, মানবসত্য থেকে সেই-পরিমাণে সে ভ্রষ্ট, সভ্যতার অভিমানসত্ত্বেও সেই পরিমাণে সে বর্ব্বর।

মানবদেহে বহুকোটি জীবকোষ, তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জন্ম স্বতন্ত্র মরণ। অণুবীক্ষণযোগে জানা যায় তাদের প্রত্যেকের চারিদিকে ফাঁক। একদিকে এই জীবকোষগুলি আপন আপন পৃথক জীবনে জীবিত, আর একদিকে তাদের মধ্যে একটি গভীর নির্দ্দেশ আছে, প্রেরণা আছে, একটি ঐক্যতত্ত্ব আছে, সেটি অগোচর পদার্থ, সেই প্রেরণা সমগ্র দেহের দিকে, সেই ঐক্য সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত। মনে করা যেতে পারে, সেই সমগ্র দেহের উপলব্ধি অসংখ্য জীবকোষের অগম্য, অথচ সেই দেহের পরম রহস্যময় আহ্বান তাদের প্রত্যেকের কাছে দাবী করচে তাদের আত্মনিবেদন। যেখানে তারা প্রত্যেকে নিজেরই স্বতন্ত্র জীবনসীমায়

বর্ত্তমান সেখানে তার মধ্যে রহস্য
যেখানে তারা নিজের জীবনসীমাকে অতিক্রম করে
সমস্ত দেহের জীবনে সত্য সেখানে তারা আশ্চর্য্য,
সেখানে তারা আপন স্বতন্ত্র জন্মমৃত্যুর মধ্যে বদ্ধ নয়।
সেইখানেই তাদের সার্থকতা।)

শোনা যায় প্রতি সাত বছর অন্তর মানুষের দেহে
এই জীবকোষগুলির পরিবর্ত্তন ঘটে। তারা বিদায়
নেয় অর্থাৎ তাদের পৃথক সত্তা থাকে না। কিন্তু
(তাদের মধ্যে যে-সত্তা সমস্ত দেহের আয়ুর অন্তর্গত
অর্থাৎ যেটা তাদের স্বদৈহিক নয় বিশ্বদৈহিক সেই
সত্তা সমস্ত দেহের জীবনপ্রবাহে থেকে যায়।)

দেহে কখনো কখনো কর্কটরোগ অর্থাৎ ক্যান্সার
জন্মায় সেই ক্যান্সার একান্তই স্বতন্ত্র, বলা যেতে
পারে তার মধ্যে দেহাত্মবোধ নেই। সমগ্র দেহের
সে প্রতিকূল। দেহের পক্ষে এ'কেই বলা যায় অশুভ।

মানুষের দেহের জীবকোষগুলির যদি আত্মবোধ
থাকত তাহলে একদিকে তারা ক্ষুদ্রভাবে আপনাদেরকে
স্বতন্ত্র জানত, আবার বৃহৎভাবে নিজেদেরকে জানত
সমগ্র দেহে। কিন্তু জানত অনুভবে, কল্পনায়,—সমগ্র
দেহকে প্রত্যক্ষত ও সম্পূর্ণত জানা সম্ভব হোত না।
কেননা এই দেহ শুধু যে বর্ত্তমানে অধিষ্ঠিত তা নয়,
এই দেহে রয়েচে তার অতীত, অপেক্ষা করচে তার

ভবিষ্যৎ। আরো একটা প্রত্যক্ষাতীত পদার্থ রয়েচে যা সর্ব্বদেহব্যাপী কল্যাণ, যাকে বলি স্বাস্থ্য, যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। তা ছাড়াও সমগ্র জীবন-রক্ষার গভীরতর চেষ্টা প্রত্যেক জীবকোষের আছে, যে-চেষ্টা রোগের অবস্থায় সর্ব্বদেহের শত্রুহননে নিজেদের আত্মহানিও ঘটায়, দেশপ্রেমিক যেমন করে দেশের জন্যে প্রাণ দেয়। এই চেষ্টার রহস্য অনুসরণ করলেই বোঝা যেতে পারে এই ক্ষুদ্র দেহগুলির চরম লক্ষ্য অর্থাৎ পরম ধর্ম্ম এমন-কিছুকে আশ্রয় করে, যাকে বলব তাদের বিশ্বদেহ।

মানুষও আপন অন্তরের গভীরতর চেষ্টার প্রতি লক্ষ্য করে অনুভব করেচে যে, সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম। সেই বিরাট মানব

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।

সেই বিশ্বমানবের প্রেরণায় ব্যক্তিগত মানুষ এমন সকল কাজে প্রবৃত্ত হয় যা তার ভৌতিক সীমা অতিক্রমণের মুখে। যাকে সে বলে ভালো, বলে সুন্দর, বলে শ্রেষ্ঠ; কেবল সমাজরক্ষার দিক থেকে নয়, আপন আত্মার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির দিক থেকে।

ডিমের ভিতরে যে পাখীর ছানা আছে তার অঙ্গে দেখতে পাই ডানার সূচনা। ডিমে-বাঁধা জীবনে সেই

ডানার কোনো অর্থই নেই। সেখানে আছে ডানার অবিচলিত প্রতিবাদ। এই অপরিণত ডানার সঙ্কেত জানিয়ে দেয়, ডিমের বাইরে সত্যের যে পূর্ণতা আজো তার কাছে অপ্রত্যক্ষ সেই মুক্ত সত্যে সঞ্চরণেই পাখীর সার্থকতা। তেমনিই মানুষের চিত্তবৃত্তির যে ঔৎসুক্য মানুষের পূর্ণ সত্যের সাক্ষ্য দেয় সেইখানেই অনুভব করি তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য থেকে মুক্তি। সেইখানে সে বিশ্বাভিমুখী।

জীবকে কল্পনা করা যাক সে যেন জীবযাত্রার একটা রেলগাড়ির মধ্যেই জন্মায়, বেঁচে থাকে এবং মরে। এই গাড়ি সঙ্কীর্ণ লক্ষ্যপথে বাঁধা রাস্তায় চলে। জন্তুর মাথাটা গাড়ির নিম্নতলের সমরেখায়। গাড়ির সীমার মধ্যে তার আহারবিহারের সন্ধান চলচে নীচের দিকে ঝুঁকে। ঐটুকুর মধ্যে বাধাবিপত্তি যথেষ্ট, তাই নিয়ে দিন কাটে। মানুষের মতো সে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে পারে না। উপরের জানলা পর্য্যন্ত পৌঁছয় না তার দৃষ্টি, তার মনের গতি নেই প্রাণধারণের বাইরে।

মানুষ খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়েচে। সামনে পেয়েচে জানলা। জানতে পেরেচে গাড়ির মধ্যেই সব কিছু বদ্ধ নয়। তার বাইরে দিগন্তের পর দিগন্ত। জীবনের আশু লক্ষ্যপথ উত্তীর্ণ হয়েও যা বাকি আছে তার আভাস পাওয়া যায়, সীমা দেখা যায় না। যেটুকু আলো

গাড়ির প্রয়োজনের পক্ষে যথোপযুক্ত, বাইরে তারি বিস্তার অবাধ অজস্র। সেই আলো তাকে ডাকে কেন? ঐ প্রয়োজনাতীত বাইরেটার প্রতি উদাসীন থাকলে ক্ষতি কী ছিল। দিন তো চলে যেত, যেমন চলচে হাজার লক্ষ প্রাণীর। কিন্তু মানুষকে অস্থির করে তুললে যে। বললে, তাকে ছাড়া পেতে হবে সেইখানেই যেখানে তার প্রয়োজন নেই, যার পরিচয় তার কাছে আজো অসম্পূর্ণ। প্রাণশক্তির অতিনির্দ্দিষ্ট সাম্রাজ্যপ্রাচীর লঙ্ঘন করে সে জয় করতে বেরোলো আপন স্বরাজ। এই জয়যাত্রার পথে তার সহজ প্রবৃত্তি তার পক্ষ নেয় না, এই পথে তার আরাম নেই, তার বিশ্রাম নেই, শত শত যাত্রী প্রাণ দিয়ে এই পথকে কেবলি প্রশস্ত করচে, উন্মুক্ত করচে।

দেহের দিকে মানুষকে বিচার করে দেখা যাক। সে উঠে দাঁড়িয়েচে। এমন কথা বলা চলে না-যে দাঁড়াবে না তো কি। দাঁড়ানো সহজ নয়। পাখীর দেহের ছন্দটা দ্বিপদী। মানুষের দেহটা চতুষ্পদ জীবের প্রশস্ত ছন্দে বানানো। চার পায়ের উপর লম্বা দেহের ওজন সামনে পিছনে ভাগ করে দিলেই এমনতরো দেহটাকে একসঙ্গে বহন ও সঞ্চালন তার পক্ষে সহজ হতে পারত। কিন্তু মানুষ আপন দেহের স্বভাবকে মানতে চাইলে না, এ জন্যে সে অসুবিধে সইতেও

রাজি। চলমান দীর্ঘ দেহটার ভাররক্ষার সাধনা করলে ঐ দুই পায়ের উপরেই। সেটা সহজসাধ্য নয়, ছেলেদের প্রথম চলার অভ্যাস দেখলেই তা বোঝা যায়। শেষ বয়সে বৃদ্ধকে লাঠির উপর ভর দিতে হয় সেও একটা প্রমাণ। এও দেখা যায় চারপেয়ে জন্তু যত সহজে ভার বহন করতে পারে মানুষ তা পারে না— এই জন্যেই অন্যের পরে নিজের বোঝা চাপাবার নানা কৌশল মানুষের অভ্যস্ত। সেই সুযোগ পেয়েচে বলেই যত পেরেচে ভার সৃষ্টি করেচে। তাকে পরিমিত করবার চেষ্টা নেই। মানুষের এই চালটা যে সহজ নয় তার দৃষ্টান্ত প্রায়ই পাওয়া যায়। ধাক্কা খেয়ে মানুষের অঙ্গহানি বা গাম্ভীর্য্যহানির যে আশঙ্কা, জন্তুদের সেটা নেই। শুধু তাই নয়, ডাক্তারের কাছে শোনা যায় মানুষ উত্তভঙ্গী নিয়েচে বলে তার আদিম অবতত দেহের অনেক যন্ত্রকে রোগদুঃখ ভোগ করতে হয়। তবু মানুষ স্পর্দ্ধা করে উঠে দাঁড়ালো।

নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে জন্তু দেখতে পায় খণ্ড খণ্ড বস্তুকে। তার দেখার সঙ্গে তার ঘ্রাণ দেয় যোগ। চোখের দেখাটা অপেক্ষাকৃত অনাসক্ত, জ্ঞানের রাজ্যে তার প্রভাব বেশি। ঘ্রাণের অনুভূতি দেহবৃত্তির সঙ্কীর্ণ সীমায়। দেখা ও ঘ্রাণ নিয়ে জন্তুরা বস্তুর যে-পরিচয় পায় সে-পরিচয় বিশেষভাবে আশু প্রয়োজনের।

উপরে মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল বস্তুকে নয়, দেখলে দৃশ্যকে অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে। একটি অখণ্ড বিস্তারের কেন্দ্রস্থলে দেখলে নিজেকে। এ'কে বলা যায় মুক্তদৃষ্টি। খাড়া-হওয়া মানুষের কাছে নিকটের চেয়ে দূরের দাম বেশি। অজ্ঞাত অভাবনীয়ের দিকে তার মন হয়েচে প্রবৃত্ত। এই দৃষ্টির সঙ্গে যোগ দিয়েচে অন্তরের কল্পনাদৃষ্টি। শুধু দৃষ্টি নয় সঙ্গে সঙ্গে ছুটো হাতও পেয়েচে মুক্তি। পায়ের কাজ থেকে হাত যদি ছুটি না পেত, তা হলে সে থাকত দেহেরই একান্ত অনুগত, চতুর্থ বর্ণের মতো অস্পৃশ্যতার মলিনতা নিয়ে। পুরাণে বলে ব্রহ্মার পায়ের থেকে শূদ্র জন্মেচে, ক্ষত্রিয় হাতের থেকে।

মানুষের দেহে শূদ্রের পদোন্নতি হোলো ক্ষাত্রধর্ম্মে, পেলো সে হাতের গৌরব, তখন মনের সঙ্গে হোলো তার মৈত্রী। মানুষের কল্পনাবৃত্তি হাতকে পেয়ে বসল। দেহের জরুরী কাজগুলো সেরে দিয়েই সে লেগে গেল নানা বাজে কাজে। জীবনযাত্রার কর্ম্মব্যবস্থায় সে whole-time কর্ম্মচারী রইল না। সে লাগল অভাবিতের পরীক্ষায়, অচিন্ত্যপূর্ব্বের রচনায়, অনেকটাই অনাবশ্যক। মানুষের ঋজুমুক্ত দেহ মাটির নিকটস্থ টান ছাড়িয়ে যেতেই তার মন এমন একটা বিরাট রাজ্যের পরিচয় পেলে যা অন্নব্রহ্মের নয় যাকে বলা যায় বিজ্ঞান

ব্রহ্মের আনন্দ-ব্রহ্মের রাজ্য। এ রাজ্যে মানুষ যে-কাজগুলো করে হিসাবী লোক জিজ্ঞাসা করতে পারে এ সব কেন? একমাত্র তার উত্তর, "আমার খুসি।" তার বিজ্ঞানে, তার সাহিত্যে, তার শিল্পকলায় এই এক উত্তর, আমার খুসি। মাথা-তোলা মানুষের এত বড়ো গর্ব্ব। জন্তুদেরও যথেচ্ছ খেলার অবকাশ আছে, কিন্তু জীবনে তাদের খেলাটা গৌণ। তা ছাড়া তাদের খেলাও প্রকৃতির অনুগত। বিড়ালছানার খেলা মিথ্যা ইঁদুর মিছামিছি ধরা, কুকুর ছানার খেলা নিজের ল্যাজের সঙ্গে লড়াই করার সগর্জ্জন ভান। কিন্তু মানুষের যে কাজটাকে লীলা বলা যায় অর্থাৎ যা তার কোনো দরকারের আমলে আসে না, কথায় কথায় সেইটেই হয়ে ওঠে মুখ্য, ছাড়িয়ে যায় তার প্রাণযাত্রাকে। সেইটের দ্বারাই তার শ্রেষ্ঠতার পরিচয়। অবকাশের ভূমিকায় মানুষ সর্ব্বত্রই আপন অমরাবতী রচনায় ব্যস্ত, সেখানে তার আকাশকুসুমের কুঞ্জবন। এই সব কাজে সে এত গৌরব বোধ করে যে চাষের ক্ষেতে তার অবজ্ঞা। আধুনিক বাংলা ভাষায় সে যাকে একটা কুশ্রাব্য নাম দিয়েচে কৃষ্টি, হাল লাঙলের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই এবং গোরুকে তার বাহন বললে ব্যঙ্গ করা হয়। বলা বাহুল্য দূরতম তারায় মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন, সেই তারার যে-আলোকরশ্মি চার পাঁচ হাজার এবং

ততোধিক বৎসর ধরে ব্যোমবিহারী, গৃহত্যাগী, তারই দৌড় মাপতে মানুষের দিন যায়, তার রাত কাটে। তা ছাড়া মানুষ অকারণে কথার সঙ্গে কথার বিনুনি করে কবিতাও লেখে; এমন কি, যারা আধপেটা খেয়ে কৃশতনু তারাও বাহবা দেয়। এর থেকেই আন্দাজ করি মানুষের অন্নের ক্ষেত প্রকৃতির এলেকায় থাকতে পারে, দেহের দ্বারে পেয়াদার তাগিদে তার খাজনাও দিতে হয়, কিন্তু যেখানে মানুষের বাস্তুভিটে সেই লাখেরাজ দেবত্রভূমি প্রকৃতির এলেকার বাইরে। সেখানে জোরতলবের দায় নেই, সেখানে সকলের চেয়ে বড়ো দায়িত্ব স্বাধীন দায়িত্ব, তাকে বলব আদর্শের দায়িত্ব, মনুষ্যত্বের দায়িত্ব।

দেহের দিক থেকে মানুষ যেমন ঊর্দ্ধশিরে নিজেকে টেনে তুলেচে খণ্ডভূমির থেকে বিশ্বভূমির দিকে, নিজের জানাশোনাকেও তেমনি স্বাতন্ত্র্য দিয়েচে জৈবিক প্রয়োজন থেকে, ব্যক্তিগত অভিরুচির থেকে। জ্ঞানের এই সম্মানে মানুষের বৈষয়িক লাভ হোক বা না হোক আনন্দ লাভ হোলো। এইটেই বিস্ময়ের কথা। পেট না ভরিয়েও কেন হয় আনন্দ? বিষয়কে বড়ো করে পায় বলে আনন্দ নয়, আপনাকেই বড়ো করে সত্য করে পায় বলে আনন্দ। মানবজীবনের যে বিভাগ অহৈতুক অনুরাগের অর্থাৎ আপনার বাহিরের সঙ্গে

অন্তরঙ্গযোগের, তার পুরস্কার আপনারই মধ্যে। কারণ সেই যোগের প্রসারেই আত্মার সত্য।

ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো-ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো-ভবতি।

জীবলোকে চৈতন্যের নীহারিকা অস্পষ্ট আলোকে ব্যাপ্ত। সেই নীহারিকা মানুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে উজ্জ্বল দীপ্তিতে বললে,

অয়মহং ভোঃ,

এই যে আমি। সেইদিন থেকে মানুষের ইতিহাসে নানাভাবে নানারূপে নানাভাষায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলল, "আমি কী।" ঠিক উত্তরটিতে তার আনন্দ, তার গৌরব। জন্তুর উত্তর পাওয়া যায় তার দৈহিক ব্যবস্থার যথাযোগ্যতায়। সনাতন গণ্ডারের মতো স্থূল ব্যবহারে গণ্ডার যদি কোনো বাহ্য বাধা না পায় তাহলে আপন সার্থক্য সম্বন্ধে তার কোনো সংশয় থাকে না। কিন্তু মানুষ কী করে হবে মানুষের মতো তাই নিয়ে বর্ব্বরদশা থেকে সভ্য অবস্থা পর্য্যন্ত তার চিন্তা ও প্রয়াসের অন্ত নেই। সে বুঝেচে সে সহজ নয়, তার মধ্যে একটা রহস্য আছে, এই রহস্যের আবরণ উদ্ঘাটিত হতে হতে

তবে সে আপনাকে চিনবে। শত শত শতাব্দী ধরে চলেচে তার প্রয়াস। কত ধর্ম্মতন্ত্র কত অনুষ্ঠানের পত্তন হোলো, সহজ প্রবৃত্তির প্রতিবাদ করে নিজেকে সে স্বীকার করাতে চায় যে, বাইরে সে যা, ভিতরে ভিতরে তার চেয়ে সে বড়ো। এমন কোনো সত্তার স্বরূপকে সে মনের মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করচে, আদর্শরূপে যিনি তার চেয়ে বড়ো অথচ তার সঙ্গে চির-সম্বন্ধযুক্ত। এমনি করে বড়ো ভূমিকায় নিজের সত্যকে স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে তার অহৈতুক আগ্রহ। যাকে সে পূজা করে তার দ্বারাই সে প্রমাণ করে তার মতে নিজে সে সত্য কিসে, তার বুদ্ধি কাকে বলে পূজনীয়, কাকে জানে পূর্ণতা বলে। সেইখানেই আপন দেবতার নামে মানুষ উত্তর দিতে চেষ্টা করে আমি কী, আমার চরম মূল্য কোথায়। বলা বাহুল্য, উত্তর দেবার উপলক্ষ্যে পূজার বিষয়কল্পনায় অনেক সময়ে তার এমন চিত্ত প্রকাশ পায় বুদ্ধিতে যা অন্ধ, শ্রেয়োনীতিতে যা গর্হিত, সৌন্দর্য্যের আদর্শে যা বীভৎস। তাকে বলব ভ্রান্ত উত্তর এবং মানুষের কল্যাণের জন্যে সকল রকম ভ্রমকেই যেমন শোধন করা দরকার এখানেও তাই। এই ভ্রমের বিচার মানুষেরই শ্রেয়োবুদ্ধি থেকেই, মানুষের দেবতার শ্রেষ্ঠতার বিচার মানুষেরই পূর্ণতার আদর্শ থেকে।

জীবসৃষ্টির প্রকাশ-পর্য্যায়ে দেহের দিকটাই যখন প্রধান ছিল তখন দেহ-সংস্থানঘটিত ভ্রম বা অপূর্ণতা নিয়ে অনেক জীবের ধ্বংস বা অবনতি ঘটেচে। জীব-সৃষ্টির প্রকাশে মানুষের মধ্যে যখন **আমি** এসে দাঁড়ালো, তখন এই **আমি** সম্বন্ধে ভুল করলে দৈহিক বিনাশের চেয়ে বড়ো বিনাশ। এই আমিকে নিয়ে ভুল কোথায় ঘটে, সে প্রশ্নের একই উত্তর দিয়েচেন আমাদের সকল মহাপুরুষ। তাঁরা এই অদ্ভুত কথা বলেন যেখানে আমিকে না-আমির দিকে জানতে বাধা পাই, তাকে অহং-বেড়ায় বিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ করে দেখি। এক আত্মলোকে সকল আত্মার অভিমুখে আত্মার সত্য। এই সত্যের আদর্শেই বিচার করতে হবে মানুষের সভ্যতা, মানুষের সমস্ত অনুষ্ঠান, তার রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম্মতন্ত্র ; এর থেকে যে পরিমাণে সে ভ্রষ্ট সেই পরিমাণে সে বর্ব্বর।

মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস। জন্তুদের বাস ভূমণ্ডলে, মানুষের বাস সেইখানে যাকে সে বলে তার দেশ। দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক। মানুষে মানুষে মিলিয়ে এই দেশ, জ্ঞানে জ্ঞানে, কর্ম্মে কর্ম্মে। যুগযুগান্তরের প্রবাহিত চিন্তাধারায় প্রীতিধারায় দেশের মন ফলে শস্যে সমৃদ্ধ। বহু লোকের আত্মত্যাগে

দেশের গৌরব সমুজ্জ্বল। যে-সব দেশবাসী অতীত কালের, তাঁরা বস্তুত বাস করতেন ভবিষ্যতে। তাঁদের ইচ্ছার গতি কর্ম্মের গতি ছিল আগামী কালের অভিমুখে। তাঁদের তপস্যার ভবিষ্যৎ আজ বর্ত্তমান হয়েচে আমাদের মধ্যে, কিন্তু আবদ্ধ হয়নি। আবার আমরাও দেশের ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমানকে উৎসর্গ করচি। সেই ভবিষ্যৎকে ব্যক্তিগতরূপে আমরা ভোগ করব না। যে তপস্বীরা অন্তহীন ভবিষ্যতে বাস করতেন, ভবিষ্যতে যাঁদের আনন্দ, যাঁদের আশা, যাঁদের গৌরব, মানুষের সভ্যতা তাঁদেরই রচনা। তাঁদেরই স্মরণ করে মানুষ আপনাকে জেনেচে অমৃতের সন্তান, বুঝেচে যে, তার দৃষ্টি, তার সৃষ্টি, তার চরিত্র মৃত্যুকে পেরিয়ে। মৃত্যুর মধ্যে গিয়ে যাঁরা অমৃতকে প্রমাণ করেচেন তাঁদের দানেই দেশ রচিত। ভাবীকালবাসীরা, শুধু আপন দেশকে নয়, সমস্ত পৃথিবীর লোককে অধিকার করেচেন। তাঁদের চিন্তা, তাঁদের কর্ম্ম, জাতিবর্ণনির্ব্বিচারে সমস্ত মানুষের। সবাই তাঁদের সম্পদের উত্তরাধিকারী। তাঁরাই প্রমাণ করেন সব মানুষকে নিয়ে সব মানুষকে অতিক্রম করে সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে এক-মানুষ বিরাজিত। সেই মানুষকেই প্রকাশ করতে হবে, শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে বলেই মানুষের বাস দেশে। অর্থাৎ এমন জায়গায় যেখানে প্রত্যেক মানুষের বিস্তার খণ্ড

খণ্ড দেশকালপাত্র ছাড়িয়ে,—যেখানে মানুষের বিদ্যা, মানুষের সাধনা সত্য হয় সকল কালের সকল মানুষকে নিয়ে।

ভবিষ্যৎকাল অসীম, অতীত কালও তাই। এই দুই দিকে মানুষের মন প্রবলভাবে আকৃষ্ট। **পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভুতং যচ্চ ভব্যম্।** যা ভূত যা ভাবী এই সমস্তই সেই পুরুষ। মানুষ ভাবতে ভালোবাসে কোনো এককালে তার শ্রেষ্ঠতার আদর্শ পূর্ব্বেই বিষয়ীকৃত। তাই প্রায় সকল জাতীয় মানুষের পুরাণে দেখা যায় সত্যযুগের কল্পনা অতীতকালে। সে মনে করে যে-আদর্শের উপলব্ধি অসম্পূর্ণ, কোনো এক দূরকালে তা পরিপূর্ণ অখণ্ড বিশুদ্ধ আকারে। সেই পুরাণের বৃত্তান্তে মানুষের এই আকাঙ্ক্ষাটি প্রকাশ পায় যে অনাদিতে যা প্রতিষ্ঠিত অসীমে তাই প্রমাণিত হতে থাকবে। যে গানটি পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ রচিত, গাওয়ার দ্বারাই সেটা ক্রমশ প্রকাশমান, এও তেমনি। মনুষ্যত্বের আদর্শ এক কোটিতে সমাপ্ত, আর এক কোটিতে উপলভ্যমান। এখনকার দিনে মানুষ অতীতকালে সত্য-যুগকে মানে না, তবু তার সকল প্রকার শ্রেয়োনুষ্ঠানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে অনাগতকালে সত্যযুগের প্রত্যাশা। কোনো ব্যক্তি নাস্তিক হতে পারে কিন্তু সেই নাস্তিক যাকে সত্য বলে জানে দূরদেশে ভাবীকালে

সেও তাকে সার্থক করবার জন্যে প্রাণ দিতে পারে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অগোচর ভবিষ্যতেই নিজেকে সত্যতররূপে অনুভব করে বলেই তার প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানকে বিসর্জ্জন দেওয়া সে ক্ষতি মনে করে না।

ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি,

পূর্ণ পুরুষের অধিকাংশ এখনো আছে অব্যক্ত। তাঁকেই ব্যক্ত করবার প্রত্যাশা নিয়ত চলেচে ভবিষ্যতের দিকে। পূর্ণ পুরুষ আগন্তুক। তাঁর রথ ধাবমান, কিন্তু তিনি এখনো এসে পৌঁছননি। বরযাত্রীরা আসচে, যুগের পর যুগ অপেক্ষা করচে, বরের বাজনা আসচে দূর থেকে। তাঁকে এগিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে দূতেরা চলেচে দুর্গম পথে। এই যে অনিশ্চিত আগামীর দিকে মানুষের এত প্রাণপণ আগ্রহ, এই যে অনিশ্চিতের মধ্যে অনাগতের মধ্যে তার চিরনিশ্চিতের সন্ধান অক্লান্ত, তারই সঙ্কটসঙ্কুল পথে মানুষ বারবার বাধা পেয়ে ব্যর্থ হয়েও যাত্রা বন্ধ করতে পারলে না। এই অধ্যবসায়কে বলা যেতে পারত পাগলামি কিন্তু মানুষ তাকেই বলেচে মহত্ত্ব। এই মহত্ত্বের আশ্রয় কোথায়? অলক্ষ্য একটা পরিপূর্ণতার দিকে মানুষের মনের আকর্ষণ দেখতে পাই; অন্ধকার ঘরের গাছে তার শাখায় প্রশাখায় যেমন একটা স্বাভাবিক ব্যাকুলতা প্রাচীরের ও-পারের আলোকের

দিকে। আলোক যেমন সত্য, পূর্ণের আকর্ষণ নিয়ত যেখান থেকে প্রেরিত সেও যদি তেমনি সত্য না হোত তাহলে জীবিকার প্রয়োজনের বাইরে আত্মার উৎকর্ষের জন্যে মানুষ যা কিছু চিন্তা করে কর্ম্ম করে তার কোনো অর্থই থাকে না। এই সত্যকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করি আমাদের সঙ্কল্পে, আমাদের ধ্যানে, আমাদের আদর্শে। সেই অভাবনীয় পূর্ণকে দেখতে পাই দুঃখের দীপ্তিতে, মৃত্যুর গৌরবে। সে আমাদের জ্ঞানকে ঘরছাড়া করে বড়ো ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েচে, নইলে পরমাণুতত্ত্বের চেয়ে পাকপ্রণালী মানুষের কাছে অধিক আদর পেত। সীমাবদ্ধ সৃষ্টিকে মানুষ প্রত্যক্ষ দেখচে, তাকে ব্যবহার করচে কিন্তু তার মন বলচে এই সমস্তেরই সত্য রয়েচে সীমার অতীতে। এই সীমাকে যদি প্রশ্ন করি তার শেষ উত্তর পাইনে এই সীমার মধ্যেই।

ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে, ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহণের সামনে দুই ব্রাহ্মণ তর্ক তুলেছিলেন, সামগানের মধ্যে যে-রহস্য আছে তার প্রতিষ্ঠা কোথায়?

দাল্‌ভ্য বললেন, "এই পৃথিবীতেই।" স্থূল প্রত্যক্ষই সমস্ত রহস্যের চরম আশ্রয় বোধ করি দাল্‌ভ্যের এই ছিল মত।

প্রবাহণ বললেন, "তাহলে তোমার সত্য তো অন্তবান হোলো, সীমায় এসে ঠেকে গেল যে।"

ক্ষতি কী তাতে। ক্ষতি এই যে, সীমার মধ্যে মানুষের জিজ্ঞাসা অসমাপ্ত থেকে যায়। কোনো সীমাকেই মানুষ চরম বলে যদি মানত তাহলে মানুষের ভৌতিক বিজ্ঞানও বহুকাল পূর্ব্বেই ঘাটে নোঙর ফেলে যাত্রা বন্ধ করত। একদিন পণ্ডিতেরা বলেছিলেন ভৌতিক বিশ্বের মূল উপাদানস্বরূপ আদিভূতগুলিকে তাঁরা একেবারে কোণ-ঠেষা করে ধরেচেন, একটার পর একটা আবরণ খুলে এমন কিছুতে ঠেকেচেন যাকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না। বললে কী হবে? অন্তরে আছেন প্রবাহণ রাজা, তিনি বহন করে নিয়ে চলেচেন মানুষের সব প্রশ্নকে সীমা থেকে দূরতর ক্ষেত্রে। তিনি বললেন,

অপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে সাম,
অন্তবদ্‌ বৈ কিল তে সাম।

আদিভূতের যে-বস্তুসীমায় প্রশ্ন এসে থেমেছিল সে সীমাও পেরোলো। আজ মানুষের চরম ভৌতিক উপলব্ধি পৌঁছল গাণিতিক চিহ্নসঙ্কেতে, কোনো বোধগম্যতায় নয়। একদিন আলোকের তত্ত্বকে মানুষ বোধগম্যতার পরপারেই স্থাপন করেছিল। অদ্ভুত কথা বলেছিল, ঈথরের ঢেউ জিনিষকেই আলোকরূপে অনুভব করি। অথচ ঈথর যে কী আমাদের বোধের ভাষায় তার কোনো কিনারা পাওয়া যায় না। আলো,

যা আমাদের দৃষ্টির ক্ষেত্রে সকল ভৌতিক জিনিষকে প্রকাশ করে, দাঁড়ালো তা এমন কিছুর প্রকাশ যা সম্পূর্ণই ভৌতিক-ধর্ম্মের অতীত, কেবল ব্যবহারে মাত্র জানা যায় যে তাতে নানা ছন্দের ঢেউ খেলে। কিন্তু প্রবাহণের গণনা থামে না। খবর আসে, কেবল তরঙ্গ-ধর্ম্মী বললে আলোর চরিত্রের হিসাব পূরো মেলে না, সে কণিকাবর্ষীও বটে। এই সব স্ববিরোধী কথা মানুষের সহজ বুদ্ধির সহজ ভাষার সীমার বাইরেকার কথা। তবু বোধাতীতের ডুবজলেও মানুষ ভয় পেলে না। পাথরের দেয়ালটাকেও বললে বিদ্যুৎকণার নিরন্তর নৃত্য। সন্দেহ করলে না যে, হয়তো বা পাগল হয়ে গেছি। মনে করলে না, হয়তো প্রজ্ঞা, যাকে বলে reason, সে মানস-সার্কাসের ডিগ্‌বাজি-খেলোয়াড়, সব জিনিষকে একবারে উল্‌টিয়ে ধরাই তার ব্যবসা। পশুরা যদি বিচারক হোত মানুষকে বলত জন্ম-পাগল্। বস্তুত মানুষের বিজ্ঞান সব মানুষকে এক-পাগলামিতে-পাওয়া জীব বলে প্রমাণ করচে। বলচে, সে যাকে যে-রকম জানচে বলে মনে করে সেটা একেবারেই তা নয়, সম্পূর্ণই উল্‌টো। জন্তুরা নিজেদের সম্বন্ধে এ রকম লাইবেল প্রচার করে না। তাদের বোধের কাছে যেটা-যা সেটা-তাই অর্থাৎ তাদের কাছে কেবল আছে তথ্য, তাদের অবিচলিত নিষ্ঠা প্রতীয়মানের প্রতি।

তাদের জগতের আয়তন কেবল তলপৃষ্ঠ নিয়ে। তাদের সমস্ত দায় ঐ একতলাটাতেই। মানবজগতের আয়তনে বেধ আছে, যা চোখে পড়ে তার গভীরে। প্রত্যক্ষ তথ্যকে উপেক্ষা করলে মানুষের চলে না, আবার সত্যকেও নইলে নয়।

অন্যান্য জন্তুর মতোই তথ্য মানুষের সম্বল, কিন্তু সত্য তার ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্যের চরম লক্ষ্য অভাব দূর করা নয়, মহিমা উপলব্ধি করানো। তাই ঐশ্বর্য্য-অভিমানী মানুষ বলেচে,

ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

বলেচে অল্পে সুখ নেই, বৃহতেই সুখ।

এটা নিতান্তই বেহিসাবী কথা হোলো। হিসাবী-বুদ্ধিতে বলে যা চাই আর যা পাই এই দুটো মাপে মিলে গেলেই সুখের বিষয়। ইংরেজিতে একটা চলতি কথা আছে, যা যথেষ্ট সেটাই ভূরিভোজের সমান-দরের। শাস্ত্রেও বলচে,

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।

তবেই তো দেখচি সন্তোষে সুখ নেই আবার সন্তোষেই সুখ এই দুটো উল্‌টো কথা সামনে এসে দাঁড়ালো। তার কারণ, মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে। তার যে-সত্তা জীবসীমার মধ্যে সেখানে যেটুকু আবশ্যক সেই

টুকুতেই তার সুখ। কিন্তু অন্তরে অন্তরে জীবমানব বিশ্বমানবে প্রসারিত, সেইদিকে সে সুখ চায় না, সে সুখের বেশি চায়, সে ভূমাকে চায়। তাই সকল জীবের মধ্যে মানুষই কেবল অমিতাচারী। তাকে পেতে হবে অমিত, তাকে দিতে হবে অমিত। কেননা তার মধ্যে আছে অমিত মানব। সেই অমিত মানব সুখের কাঙাল নয়, দুঃখভীরু নয়। সেই অমিত মানব আরামের দ্বার ভেঙে কেবলি মানুষকে বের করে নিয়ে চলেচে কঠোর অধ্যবসায়ে। আমাদের ভিতরকার ছোট মানুষটি তা নিয়ে বিদ্রূপ করে থাকে, বলে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। উপায় নেই। বিশ্বের মানুষটি ঘরের মানুষকে পাঠিয়ে দেন বুনো মোষটাকে দাবিয়ে রাখতে, এমন কি, ঘরের খাওয়া যথেষ্ট না জুটলেও।

উপনিষদে ভগবান সম্বন্ধে একটি প্রশ্নোত্তর আছে। **স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ**, সেই ভগবান কোথায় প্রতিষ্ঠিত। এই প্রশ্নের উত্তর, **স্বে মহিম্নি**। নিজের মহিমায়। সেই মহিমাই তাঁর স্বভাব। সেই স্বভাবেই তিনি আনন্দিত।

মানুষেরও আনন্দ মহিমায়। তাই বলা হয়েচে, **ভূমৈব সুখম্‌**। কিন্তু যে স্বভাবে তার মহিমা সেই স্বভাবকে সে পায় বিরোধের ভিতর দিয়ে, পরম সুখকে পায় পরম দুঃখে। মানুষের সহজ অবস্থা ও

স্বভাবের মধ্যে নিত্যই দ্বন্দ্ব। তাই ধর্ম্মের পথকে অর্থাৎ মানুষের পরম স্বভাবের পথকে **দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।**

জন্তুর অবস্থাও যেমন স্বভাবও তার অনুগত। তার বরাদ্দও যা, কামনাও তার পিছনে চলে বিনা বিদ্রোহে। তার যা পাওনা, তার বেশি তার দাবী নেই। মানুষ বলে বসল আমি চাই উপ্‌রি-পাওনা। বাঁধা বরাদ্দের সীমা আছে, উপ্‌রি-পাওনার সীমা নেই। মানুষের জীবিকা চলে বাঁধা বরাদ্দে, উপ্‌রি-পাওনা দিয়ে প্রকাশ পায় তার মহিমা।

জীবধর্ম্মরক্ষার চেষ্টাতেও মানুষের নিরন্তর একটা দ্বন্দ্ব আছে। সে হচ্চে প্রাণের সঙ্গে অপ্রাণের দ্বন্দ্ব। অপ্রাণ আদিম, অপ্রাণ বিরাট। তার কাছ থেকে রসদ সংগ্রহ করতে হয় প্রাণকে, মালমস্‌লা নিয়ে গড়ে তুলতে হয় দেহযন্ত্র। সেই অপ্রাণ নিষ্ঠুর মহাজনের মতো, ধার দেয় কিন্তু কেবলি টানাটানি করে ফিরে নেবার জন্যে, প্রাণকে দেউলে করে দিয়ে মিলিয়ে দিতে চায় পঞ্চভূতে।

এই প্রাণচেষ্টাতে মানুষের শুধু কেবল অপ্রাণের সঙ্গে প্রাণের দ্বন্দ্ব নয়, পরিমিতের সঙ্গে অপরিমিতের। বাঁচবার দিকেও তার উপ্‌রি-পাওনার দাবী। বড়ো করে বাঁচতে হবে, তার অন্ন যেমন-তেমন নয়; তার বসন,

তার বাসস্থান কেবল কাজ চলাবার জন্যে নয়, বড়োকে প্রকাশ করবার জন্যে। এমন-কিছুকে প্রকাশ যাকে সে বলে থাকে মানুষের প্রকাশ, জীবযাত্রাতেও যে-প্রকাশে ন্যূনতা ঘটলে মানুষ লজ্জিত হয়। সেই তার বাড়তি ভাগের প্রকাশ নিয়ে মানুষের যেমন দুঃসাধ্য প্রয়াস এমন তার সাধারণ প্রয়োজন মেটাবার জন্যও নয়। মানুষের মধ্যে যিনি বড়ো আছেন আহারে বিহারেও পাছে তাঁর অসম্মান হয় মানুষের এই এক বিষম ভাবনা।

ঋজু হয়ে চলতে গিয়ে প্রতি মুহূর্ত্তেই মানুষকে ভারাকর্ষণের বিরুদ্ধে মান বাঁচিয়ে চলতে হয়। পশুর মতো চলতে গেলে তা করতে হোত না। মনুষ্যত্ব বাঁচিয়ে চলাতেও তার নিয়ত চেষ্টা, পদে পদেই নীচে পড়বার শঙ্কা। এই মনুষ্যত্ব বাঁচানোর দ্বন্দ্ব মানবধর্ম্মের সঙ্গে পশুধর্ম্মের দ্বন্দ্ব অর্থাৎ আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের। মানুষের ইতিহাসে এই পশুও আদিম। সে টানচে তামসিকতায়, মূঢ়তার দিকে। পশু বলচে সহজধর্ম্মের পথে ভোগ করো, মানুষ বলচে, মানবধর্ম্মের দিকে তপস্যা করো। যাদের মন মন্থর, যারা বলে, যা আছে তাই ভালো, যা হয়ে গেছে তাই শ্রেষ্ঠ, তারা রইল জন্তুধর্ম্মের স্থাবর বেড়াটার মধ্যে, তারা মুক্ত নয়, তারা স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট। তারা পূর্ব্বসঞ্চিত ঐশ্বর্য্যকে বিকৃত করে, নষ্ট করে।

মানুষ একদিকে মৃত্যুর অধিকারে আর একদিকে অমৃতে;—একদিকে সে ব্যক্তিগত সীমায়, আর এক-দিকে বিশ্বগত বিরাটে। এই দুয়ের কোনোটাকেই উপেক্ষা করা চলে না। মানুষ নিজেকে জানে

তদ্দূরে তদ্বন্তিকে চ

—সে দূরেও বটে, সে নিকটেও। সেই দূরের মানুষের দাবী নিকটের মানুষের সব কিছুকেই ছাড়িয়ে যায়। এই অপ্রত্যক্ষের দিকে মানুষের কল্পনা-বৃত্তি দৌত্য করে। ভুল করে বিস্তর, যেখানে থই পায় না সেখানে অদ্ভুত সৃষ্টি দিয়ে ফাঁক ভরায়, তবুও এই অপ্রতিহত প্রয়াস সত্যকেই প্রমাণ করে,—মানুষের এই একটি আশ্চর্য্য সংস্কারের সাক্ষ্য দেয়, যে, যেখানে আজো তার জানা পৌঁছয়নি সেখানেও শেষ হয়নি তার জানা।

গাছে গাছে ঘর্ষণে আগুন জ্বলে। জ্বলে বলেই জ্বলে এই জেনে চুপ করে থাকলে মানুষের বুদ্ধিকে দোষ দেওয়া যেত না। জানবার নেই বলেই জানা যাচ্চে না এ কথাটা সঙ্গত নয় তো কী। কিন্তু মানুষ ছেলেমানুষের মতো বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, ঘর্ষণে আগুন জ্বলে কেন? বুদ্ধির ব্যাগারখাটুনি সুরু হোলো। খুব সম্ভব গোড়ায় ছেলেমানুষের মতোই জবাব দিয়েছিল; হয়তো বলেছিল গাছের মধ্যে একটা রাগী ভূত অদৃশ্য-

ভাবে বাস করে, মার খেলে সে রেগে আগুন হয়ে ওঠে। এই রকম সব উত্তরে মানুষের পুরাণ বোঝাই-করা। যাদের শিশুবুদ্ধি কিছুতেই বাড়তে চায় না তারা এই রকম উত্তরকে আঁকড়ে ধরে থাকে। কিন্তু অল্পে-সন্তুষ্ট মূঢ়তার মাঝখানেও মানুষের প্রশ্ন বাধা ঠেলে ঠেলে চলে। কাজেই উনুন ধরাবার জন্যে আগুন জ্বালতে মানুষকে যত চেষ্টা করতে হয়েচে তার চেয়ে সে কম চেষ্টা করেনি আগুন জ্বলে কেন তার অনাবশ্যক উত্তর বের করতে। এদিকে হয়ত উনুনের আগুন গেছে নিবে, হাঁড়ি চড়েনি, পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলচে, প্রশ্ন চলচেই আগুন জ্বলে কেন? সাক্ষাৎ আগুনের মধ্যে তার উত্তর নেই, উত্তর আছে প্রত্যক্ষ আগুনকে বহুদূরে ছাড়িয়ে। জন্তু-বিচারক মানুষকে কি নির্ব্বোধ বলবে না, আমরা পতঙ্গকে যেমন বলি মূঢ়, বারবার যে-পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে?

এই অদ্ভুত বুদ্ধির সকলের চেয়ে স্পর্দ্ধা প্রকাশ পায় যখন মানুষকে সে ঠেলা দিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে তুমি আপনি কে। এমন কথা বলতেও তার বাধে না যে মনে হচ্চে বটে তুমি আছ কিন্তু সত্যই তুমি আছ কি, তুমি আছ কোথায়। উপস্থিত মতো কোনো জবাব না খুঁজে পেয়ে তাড়াতাড়ি যদি বলে বসি, আছি দেহধর্ম্মে, অমনি অন্তর থেকে প্রবাহণ রাজা মাথা নেড়ে

বলবেন ওখানে প্রশ্নের শেষ হতে পারে না। তখন মানুষ বললে **ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্,** মানবধর্ম্মের গভীর সত্য নিহিত আছে গোপনে। আমার **এই** আমি আছে প্রত্যক্ষে, **সেই** আমি আছে অপ্রত্যক্ষে।

কথাটা স্পষ্ট করে বুঝে দেখবার চেষ্টা করা যাক।

এই যে জল, এই যে স্থল, এই যে এটা, এই যে ওটা, যত কিছু পদার্থকে নির্দ্দেশ করে বলি এই-যে, এ সমস্তই ভালো করে জেনে-বুঝে নিতে হবে নইলে ভালো করে বাঁচা যায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বলে, **তদ্বিদ্ধি নেদং যদিদম্ উপাসতে।** তাকেই জানো। কাকে, না ইদং অর্থাৎ এই-যে ব'লে যাকে স্বীকার করি তাকে নয়। "এই যে আমি শুনচি," এ হোলো সহজ কথা। তবুও মানুষ বললে এর শেষ কথা সেইখানে যেখানে ইদং সর্ব্বনাম পৌঁছয় না। ক্ষ্যাপার মতো সে জিজ্ঞাসা করে কোথায় আছে

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং

—শ্রবণেরও শ্রবণ। ভৌতিক প্রণালীতে খোঁজ করতে করতে এসে ঠেকে বাতাসের কম্পনে। কিন্তু ওখানেও রয়েচে ইদং, এই-যে কম্পন। কম্পন তো শোনা নয়। যে বলচে, আমি শুনচি, তার কাছে পৌঁছনো গেল। তারো সত্য কোথায়।

উপর থেকে নীচে পড়ল একটা পাথর। জ্ঞানের দেউড়িতে যে-দ্বারী থাকে সে খবর দিলে, এই-যে পড়েচে। নীচের দিকে উপরের বস্তুর যে-টান সেইটে ঘটল। দ্বারীর কর্ত্তব্য শেষ হোলো। ভিতর মহল থেকে শোনা গেল, একে টান, ওকে টান, তাকে টান, বারে বারে "এই-যে।" কিন্তু সব এই-যেকে পেরিয়ে বিশ্বজোড়া একমাত্র টান।

উপনিষদ সকলের মধ্যে এই এককে জানাই বলেন,

প্রতিবোধ বিদিতম্

—প্রত্যেক পৃথক পড়ার বোধে একটি অদ্বিতীয় টানকে সত্য বলে জানা। তেমনি, আমি শুনি, তুমি শোনো, এখন শুনি, তখন শুনি, এই প্রত্যেক শোনার বোধে যে-একমাত্র পরম শোনার সত্য বিদিত সেই প্রতিবোধবিদিত এক সত্যই

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং।

তার সম্বন্ধে উপনিষদ বলেন, **অন্যদেব তদ্বিদিতা-দথো অবিদিতাদধি।** আমরা যা-কিছু জানি এবং জানিনে সব হতেই স্বতন্ত্র। ভৌতিক বিজ্ঞানেও যা গুহাহিত তাকে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে কেবল যে মেলাতে পারিনে তা নয়, বলতে হয় এ তার বিপরীত। ভাষায় বলি ভারাকর্ষণ শক্তি,

কিন্তু আকর্ষণ বলতে সাধারণত যা বুঝি এ তা নয়, শক্তি বলতে যা বুঝি এ তাও নয়।

প্রকৃতির গুহাহিত শক্তিকে আবিষ্কার ও ব্যবহার করেই মানুষের বাহিরের সমৃদ্ধি; যে-সত্যে তার আত্মার সমৃদ্ধি সেও গুহাহিত, তাকে সাধনা করেই পেতে হবে। সেই সাধনাকে মানুষ বলে ধর্ম্মসাধনা।

ধর্ম্ম শব্দের অর্থ স্বভাব। চেষ্টা করে সাধনা করে স্বভাবকে পাওয়া কথাটা শোনায় স্ববিরোধী অর্থাৎ স্বভাবকে অতিক্রম করে স্বভাবকে পাওয়া। খৃষ্টান-শাস্ত্রে মানুষের স্বভাবকে নিন্দা করেচে। বলেচে, তার আদিতেই পাপ, অবাধ্যতা। ভারতীয় শাস্ত্রেও আপনার সত্য পাবার জন্যে স্বভাবকে অস্বীকার করতে বলে। মানুষ নিজে সহজে যা তাকে শ্রদ্ধা করে না। মানুষ বলে বসল তার সহজ স্বভাবের চেয়ে তার সাধনার স্বভাব সত্য। একটা স্বভাব তার নিজেকে নিয়ে আর একটা স্বভাব তার ভূমাকে নিয়ে।

কথিত আছে,

> শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্-
> তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
> তয়োঃ শ্রেয়আদদানস্য সাধু
> হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়োবৃণীতে॥

মানুষের স্বভাবে শ্রেয়ও আছে প্রেয়ও আছে। ধীর

ব্যক্তি দুইকে পৃথক করেন। যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি সাধু, যিনি প্রেয়কে করেন তিনি পুরুষার্থ থেকে হীন হন।

এ সব কথাকে আমরা চিরাভ্যস্ত হিতকথা বলে গণ্য করি অর্থাৎ মনে করি, লোক-ব্যবহারের উপদেশ-রূপেই এর মূল্য। কিন্তু সমাজ-ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করেই এ শ্লোকটি বলা হয়নি। এই শ্লোকে আত্মাকে সত্য করে জানবার উপায় আলোচনা করা হয়েচে।

প্রবৃত্তির প্রেরণায় আমরা যা ইচ্ছা করি সেই প্রেয়ের ইচ্ছা মানুষের স্বভাবে বর্ত্তমান, আবার যা ইচ্ছা করা উচিত সেই শ্রেয়ের ইচ্ছাও মানুষের স্বভাবে। শ্রেয়কে গ্রহণ করার দ্বারা মানুষ কিছু একটা পায় যে তা নয় কিছু একটা হয়। সেই হওয়াকে বলে সাধু হওয়া। তার দ্বারা ধনী হয় না, বলী হয় না, সমাজে সম্মানিত হতেও পারে, না হতেও পারে, এমন কি, অবমানিত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। সাধু হওয়া পদার্থটা কী, প্রকৃতির রাজ্যে তার কোনো কিনারা নেই। শ্রেয় শব্দটাও তেমনি। অপরপক্ষে প্রেয়কে একান্ত-রূপে বরণ করার দ্বারা মানুষ আর-একটা কিছু হয়, তাকে উপনিষদ বলচেন আপন অর্থ থেকে হীন হওয়া। নাগর শব্দ বলতে যদি citizen না বুঝিয়ে libertine বোঝায় তাহলে বলতে হয় নাগর শব্দ আপন সত্য

অর্থ হতে হীন হয়ে গেছে। তেমনি একান্তভাবে প্রেয়কে অবলম্বন করলে মানুষ বলতে যা বোঝায় সেই সত্য হীন হয়ে যায়। নিজের মধ্যে সর্ব্বকালীন বিশ্ব-ভূমীন মনুষ্যধর্ম্মের উপলব্ধিই সাধুতা, হীনতা সেই মহামানবের উপলব্ধি থেকে বিচ্যুত হওয়া। প্রাকৃতিক স্বভাবের উপরেও মানুষের আত্মিক স্বভাব যদি না থাকত তাহলে এ সব কথার অর্থ থাকত না।

ডিমের মধ্যেই পাখীর প্রথম জন্ম। তখনকার মতো সেই ডিমটাই তার একমাত্র ইদং। আর কিছুই সে জানে না। তবু তার মধ্যে একটা প্রবর্ত্তনা আছে বাইরের অজানার মধ্যে সার্থকতার দিকে। সেই সার্থকতা **নেদং যদিদমুপাসতে।** যদি খোলাটার মধ্যেই একশো বছর সে বেঁচে থাকত তাহলে সেটাকেই বলা যেত তার মহতী বিনষ্টি।

মানুষের সাধনাও এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের সাধনা। ব্যক্তিগত সংস্কার ছাড়িয়ে যাবে তার জিজ্ঞাসা তবেই বিশ্বগতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে তার বিজ্ঞান। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও জড় প্রথাগত অভ্যাস কাটিয়ে যাবে তার প্রয়াস তবেই বিশ্বগত কর্ম্মের দ্বারা সে হবে বিশ্বকর্ম্মা। অহঙ্কারকে ভোগাসক্তিকে উত্তীর্ণ হবে তার প্রেম, তবেই বিশ্বগত আত্মীয়তায় মানুষ হবে মহাত্মা। মানুষের একটা স্বভাবে আবরণ অন্য স্বভাবে মুক্তি।

জ্যোতির্ব্বিদ দেখলেন কোনো গ্রহ আপন কক্ষপথ থেকে বিচলিত। নিঃসন্দেহ মনে বললেন অন্য কোনো অগোচর গ্রহের অদৃশ্য শক্তি তাকে টান দিয়েচে। দেখা গেল মানুষেরও মন আপন প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট প্রাণধারণের কক্ষপথ যথাযথ আবৃত্তি করে চলচে না। অনির্দ্দিষ্টের দিকে স্বভাবের অতীতের দিকে ঝুঁকচে। তার থেকে মানুষ কল্পনা করলে দেবলোক। বললে, আদেশ সেইখানকার, আকর্ষণ সেখান হতে। কে সেই দেবলোকের দেবতা তা নিয়ে মানুষে মানুষে হানাহানি চলেচে। যিনিই হোন, তাঁকে দেবতাই বলি আর যাই বলি, মানুষকে জীবসীমার মধ্যে কিছুতেই স্থির থাকতে দিলেন না।

সমুদ্র চঞ্চল হোলো। জোয়ারভাঁটার ওঠা-পড়া চলচেই। চাঁদ না দেখা গেলেও সমুদ্রের চাঞ্চল্যেই চাঁদের আহ্বান প্রমাণ হোতো। বাঁচবার চেষ্টাতেও মানুষ অনেক সময় মরে। যে-ক্ষুধা তার অন্তরে, নিঃসংশয়,—তার লক্ষ্য যে তার বাইরেও সত্য সে কথাটা সদ্যোজাত শিশুও স্বতই জানে। মানুষের প্রাণান্তিক উদ্যম দেখা গেছে এমন-কিছুর জন্যে যার সঙ্গে বাঁচবার প্রয়োজনের কোনো যোগই নেই। মৃত্যুকে ছাড়িয়ে আছে যে-প্রাণ সেই তাকে দুঃসাহসের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেচে। ভৌতিক প্রাণের পথে

প্রাণীর নিজেকে রক্ষা, আর এ পথে আত্মবানের আত্মাকে রক্ষা নয় আত্মাকে প্রকাশ।

বৈদিক ভাষায় ঈশ্বরকে বলেচে **আবিঃ,** প্রকাশ-স্বরূপ। তাঁর সম্বন্ধে বলেচে, **যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।** তাঁর মহদ্‌ যশই তাঁর নাম, তাঁর মহৎ কীর্ত্তিতেই তিনি সত্য। মানুষের স্বভাবও তাই,—আত্মাকে প্রকাশ। বাইরে থেকে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করার দ্বারাই প্রাণী আপনাকে রক্ষা করে, বাইরে আপনাকে উৎসর্গ করার দ্বারাই আত্মা আপনাকে প্রকাশ করে। এইখানে প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে গিয়ে সে আপনাকে ঘোষণা করে। এমন কি, বর্ব্বর দেশের মানুষও নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টায় প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করতে চায়। সে নাক ফুঁড়ে মস্ত এক শলা দিয়েচে চালিয়ে। উখো দিয়ে দাঁত ঘষে ঘষে ছুঁচোলো করেচে। শিশুকালে তক্তা দিয়ে চেপে বিকৃত করেচে মাথার খুলি, বানিয়েচে বিকটাকার বেশভূষা। এই সব উৎকট সাজে সজ্জায় অসহ্য কষ্ট মেনেচে। বলতে চেয়েচে সে নিজে সহজে যা তার চেয়ে সে বড়ো। সেই তার বড়ো-আমি প্রকৃতির বিপরীত। যে-দেবতাকে সে আপন আদর্শ বলে মানে সেও এমনি অদ্ভুত, তার মহিমার প্রধান পরিচয় এই যে সে অপ্রাকৃতিক। প্রকৃতির হাতে পালিত তবু প্রকৃতিকে দুয়ো দেবার জন্যে মানুষের এই যেন একটা ঝগড়াটে

ভাব। ভারতবর্ষেও দেখি কত লোক, কেউ বা ঊর্দ্ধবাহু, কেউ বা কণ্টক-শয্যায় শয়ান, কেউ বা অগ্নি-কুণ্ডের দিকে নতশীর্ষ। তারা জানাচ্চে তারা শ্রেষ্ঠ, তারা সাধু, কেননা তারা অস্বাভাবিক। আধুনিক পাশ্চাত্য-দেশেও কত লোক নিরর্থক কৃচ্ছ্রসাধনের গৌরব করে। তাকে বলে রেকর্ড ব্রেক করা, দুঃসাধ্যতার পূর্ব্ব অধ্যবসায় পার হওয়া। সাঁতার কাটচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বাইসিক্‌লে অবিশ্রাম ঘুরপাক খাচ্চে, দীর্ঘ উপবাস করচে স্পর্দ্ধা করে, কেবলমাত্র অস্বাভাবিকতার গৌরব প্রচারের জন্যে। ময়ূরকে দেখা যায় গর্ব্ব করতে আপন ময়ূরত্ব নিয়েই, হিংস্রজন্তু উৎসাহ বোধ করে আপনার হিংস্রতার সাফল্যে। কিন্তু বর্ব্বর মানুষ মুখশ্রীর বিকৃতি ও বেশভূষার অতিকৃতি নিয়ে গর্ব্ব করে, জানায় আমি ঠিক মানুষের মতো নই, সাধারণ মানুষরূপে আমাকে চেনবার জো নেই। এমনতরো আত্মপ্রকাশের চেষ্টাকে বলি নঙর্থক, এ সদর্থক নয়, প্রকৃতির বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধা মাত্র, যা তার সহজ তার প্রতিবাদমাত্র, তার বেশি আর কোনো অর্থ এতে নেই। অহঙ্কারের প্রকাশকে আত্ম-গৌরবের প্রকাশ বলে মনে করা বর্ব্বরতা, যেমন নিরর্থক বাহ্যানুষ্ঠানকে মনে করা পুণ্যানুষ্ঠান।

এ যেমন দৈহিক দিকে তেমনি আর্থিক দিকেও মানুষের স্পর্দ্ধার অন্ত নেই। এখানেও রেকর্ড ব্রেক

করা পূর্ব্ব ইতিহাসের বেড়া-ডিঙোনো লম্ফ। এখানকার চেষ্টা ঠিক অস্বাভাবিকের জন্যে নয়, অসাধারণের জন্যে। এতে আছে সীমার প্রতি অসহিষ্ণুতা, তার বাইরে আর কিছুই নয়। কিন্তু যা কিছু বস্তুগত, যা বাহিক, সীমাই তার ধর্ম্ম। সেই সীমাকে বাড়িয়ে চলা যায়, পেরিয়ে যাওয়া যায় না। যিশুখৃষ্ট বলেচেন সূচীর রন্ধ্র দিয়ে উট যেমন গলে না ধনীর পক্ষে স্বর্গদ্বার তেমনি দুর্গম। কেননা ধনী নিজের সত্যকে এমন কিছুর দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করতে অভ্যস্ত যা অপরিমেয়ের বিপরীত, তাই সে হীয়তেহর্থাৎ, মনুষ্যত্বের অর্থ হতে হীন হয়। হাতির মতো বড়ো হওয়াকে মানুষ বড়ো লোক হওয়া বলে না, হয়তো বর্ব্বর মানুষ তাও বলে। বাহিরের উপকরণ পুঞ্জিত করার গর্ব্ব করা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। অন্যের চেয়ে আমার বস্তুসঞ্চয় বেশি, এ কথা মানুষের পক্ষে বলবার কথা নয়। তাই মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, **যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্,** তিনি উপেক্ষা করেছিলেন **উপকরণবতাং জীবিতম্**। যে ওস্তাদ তানের অজস্রতা গণনা করে গানের শ্রেষ্ঠতা বিচার করে তার বিদ্যাকে সেই উটের সঙ্গে তুলনা করব। শ্রেষ্ঠগান এমন পর্য্যাপ্তিতে এসে স্তব্ধ হয় যার উপরে আর একটি মাত্র সুরও যোগ করা যায় না।

বস্তুত গানের সেই থামাকে সীমা বলা যায় না। সে এমন একটি শেষ যার শেষ নেই। অতএব যথার্থ গায়কের আত্মা আপন সার্থতাকে প্রকাশ করে তানের প্রভূত সংখ্যার দ্বারা নয়, সমগ্র গানের সেই চরম রূপের দ্বারা যা অপরিমেয়, অনির্ব্বচনীয়, বাইরের দৃষ্টিতে যা স্বল্প, অন্তরে যা অসীম। তাই মানুষের যে-সংসার তার অহং-এর ক্ষেত্রে, সেদিকে তার অহঙ্কার ভূরিতায়, যেদিকে তার আত্মা সে-দিকে তার সার্থকতা ভূমায়। একদিকে তার গর্ব্ব স্বার্থসিদ্ধিতে, আর একদিকে তার গৌরব পরিপূর্ণতায়। সৌন্দর্য্য, কল্যাণ, বীর্য্য, ত্যাগ প্রকাশ করে মানুষের আত্মাকে, অতিক্রম করে প্রাকৃত মানুষকে, উপলব্ধি করে জীবমানবের অন্তরতম বিশ্বমানবকে। **যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।**

চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে অন্য সকল প্রাণী, বাইরে থেকে জীবিকার অর্থ খুঁজে খুঁজে। মানুষ আপন অন্তরের মধ্যে আশ্চর্য্য হয়ে কাকে অনুভব করলে যিনি **নিহিতার্থো দধাতি,** যিনি তাকে তার অন্তর্নিহিত অর্থ দিচ্চেন। সেই অর্থ মানুষের আপন আত্মারই গভীর অর্থ, সেই অর্থ এই যে মানুষ মহৎ, মানুষকে প্রমাণ করতে হবে যে, সে মহৎ, তবেই প্রমাণ হবে যে, সে মানুষ; প্রাণের মূল্য দিয়েও তার আপন ভূমাকে প্রকাশ

করতে হবে, কেননা তিনি চিরন্তন মানব, সর্ব্বজনীন মানব, তিনি মৃত্যুর অতীত, তাঁকে যে-অর্ঘ্য দিতে হবে সে-অর্ঘ্য সকল মানুষের হয়ে সকল কালের হয়ে আপনারি অন্তরতম বেদীতে। আপনারি পরমকে না দেখে মানুষ বাইরের দিকে সার্থকতা খুঁজে বেড়ায়। শেষকালে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে সে বলে, **কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম**। মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ; জ্ঞানে কর্ম্মে ভাবে যে-পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই,—অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাইনে। মানুষের যত-কিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। সেই বাইরে বিক্ষিপ্ত আপনাহারা মানুষের বিলাপগান একদিন শুনেছিলেম পথিক ভিখারীর মুখে—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

সেই নিরক্ষর গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনেছিলেম,

তোরি ভিতর অতল সাগর।

সেই পাগলই গেয়েছিল,

মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ,—

সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা বেদে আছে

আবিরাবীর্ম এধি—

পরম মানবের বিরাটরূপে যাঁর স্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।

মানুষের ধর্ম

দুই

অথর্ববেদ বলেচেন :—

> ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং
> শ্রমো ধর্ম্মশ্চ কর্ম্ম চ
> ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিষ্টে
> বীর্য্যং লক্ষ্মীর্বলং বলে।

ঋত সত্য তপস্যা রাষ্ট্র শ্রম ধর্ম্ম কর্ম্ম ভূত ভবিষ্যৎ বীর্য্য সম্পদ বল সমস্তই উচ্ছিষ্টে অর্থাৎ উদ্বৃত্তে আছে। অর্থাৎ মানবধর্ম্ম বলতে আমরা যা বুঝি প্রকৃতির প্রয়োজন সে পেরিয়ে, সে আসচে অতিরিক্ততা থেকে। জীব-জগতে মানুষ বাড়তির ভাগ। প্রকৃতির বেড়ার মধ্যে তাকে কুলোলো না। ইতিপূর্ব্বে জীবাণুকোষের সঙ্গে সমগ্র দেহের সম্বন্ধ আলোচনা করেছিলুম। অথর্ববেদের ভাষায় বলা যেতে পারে প্রত্যেক জীবকোষ তার অতিরিক্তের মধ্যে বাস করে। সেই অতিরিক্ততাতেই উৎপন্ন হচ্চে স্বাস্থ্য আনন্দ শক্তি, সেই অতিরিক্ততাকেই অধিকার ক'রে আছে সৌন্দর্য্য, সেই অতিরিক্ততাতেই প্রসারিত ভূত ভবিষ্যৎ। জীবকোষ এই সমগ্র দেহগত

বিভূতি উপলব্ধি করে না। কিন্তু মানুষ প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট আপন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে পেরিয়ে যায়; পেরিয়ে গিয়ে যে-আত্মিক সম্পদকে উপলব্ধি করে অথর্ব্ববেদ তাকেই বলেচেন ঋতং সত্যং। এ সমস্তই বিশ্বমানবমনের ভূমিকায়, যারা এ'কে স্বীকার করে তারাই মনুষ্যত্বের পদবীতে এগোতে থাকে। অথর্ব্ববেদ যে সমস্ত গুণের কথা বলেচেন তার সমস্তই মানবগুণ। তার যোগে আমরা যদি আমাদের জীবধর্ম্ম-সীমার অতিরিক্ত সত্তাকে অনুভব করি তবে বলতে হবে সে সত্তা কখনোই অমানব নয় তা মানবব্রহ্ম। আমাদের ঋতে সত্যে তপস্যায় ধর্ম্মে কর্ম্মে সেই বৃহৎ মানবকে আমরা আত্মবিষয়ীকৃত করি। এই কথাটিকেই উপনিষদ আর এক রকম ক'রে বলেচেন—

এষাস্য পরমা গতি
এষাস্য পরমা সম্পদ্
এষোঽস্য পরমো লোক
এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।

এখানে উনি এবং এ, এই দুয়ের কথা। বলচেন, উনি এর পরম গতি, উনি এর পরম সম্পদ, উনি এর পরম আশ্রয়, উনি এর পরম আনন্দ। অর্থাৎ এর পরিপূর্ণতা তাঁর মধ্যে। উৎকর্ষের পথে এ চলেচে সেই বৃহতের দিকে, এর ঐশ্বর্য্য সেইখানেই, এর প্রতিষ্ঠা

তাঁর মধ্যেই, এর শাশ্বত আনন্দের ধন যা-কিছু সে তাঁতেই।

এই তিনি, বস্তু-অবচ্ছিন্ন একটা তত্ত্বমাত্র নন। যাকে বলি আমার আমি সে যেমন অন্তরতমভাবে আমার একান্ত বোধ-বিষয় তিনিও তেমনি। যখন তাঁর প্রতি ভক্তি জেগে ওঠে, যখন তাঁতে আনন্দ পাই তখন আমার এই আমি-বোধই বৃহৎ হয় গভীর হয় প্রসারিত হয় আপন সীমাতীত সত্যে। তখন অনুভব করি, এক বৃহৎ আনন্দের অন্তর্গত আমার আনন্দ। অন্য কোনো গ্রন্থে এ-সম্বন্ধে যে-উপমা ব্যবহার করেচি এখানে তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই।

একখণ্ড লোহার রহস্যভেদ ক'রে বৈজ্ঞানিক বলেচেন সেই টুক্‌রোটি আর কিছুই নয়, কতকগুলি বিশেষছন্দের বিদ্যুৎমণ্ডলীর চিরচঞ্চলতা। সেই মণ্ডলীর তড়িৎকণাগুলি নিজেদের আয়তনের অনুপাতে পরস্পরের থেকে বহু দূরে দূরে অবস্থিত। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যা ধরা পড়েচে সহজ দৃষ্টিতে যদি সেই রকম দেখা যেত তাহলে মানবমণ্ডলীতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেমন পৃথক দেখি তেমনি তাদেরও দেখতুম। এই অণুগুলি যত পৃথকই হোক এদের মধ্যে একটা শক্তি কাজ করচে। তাকে শক্তিই বলা যাক। সে সম্বন্ধ-শক্তি, ঐক্য-শক্তি, সে ঐ লৌহখণ্ডের সংঘ-শক্তি। আমরা যখন লোহা দেখচি

তখন বিদ্যুৎকণা দেখচিনে, দেখচি সংঘরূপকে। বস্তুত এই যে লোহার প্রতীয়মান রূপ এ একটা প্রতীক। বস্তুটা পরমার্থত যা এ তা নয়। অন্যবিধ দৃষ্টি যদি থাকে তবে এর প্রকাশ হবে অন্যবিধ। দশটাকার নোট পাওয়া গেল, বিশেষ রাজত্বে তার বিশেষ মূল্য। এ'কে দেখবামাত্র যে জানে যে এই কাগজখানা স্বতন্ত্র দশ-সংখ্যক টাকার সংঘরূপ তাহলেই সে এ'কে ঠিক জানে। কাগজখানা ঐ সংঘের প্রতীক।

আমরা যাকে চোখে দেখচি লোহা সেও প্রকাশ করচে সেই সংঘকে যাকে চোখে দেখা যায় না, দেখা যায় স্থূল প্রতীকে। তেমনি ব্যক্তিগত মানুষগুলির মধ্যে দেশকালের ব্যবধান যথেষ্ট, কিন্তু সমস্ত মানুষকে নিয়ে আছে একটি বৃহৎ এবং গভীর ঐক্য। সেই ইন্দ্রিয়-বোধাতীত ঐক্য সাংখ্যিক সমষ্টিকে নিয়ে নয়, সমষ্টিকে অতিক্রম ক'রে। সেই হচ্চে সমস্তের এক গূঢ় আত্মা, **একধৈবানুদ্রষ্টব্যঃ,** কিন্তু বহুধাশক্তিযোগে তার প্রকাশ। সমস্ত মানুষের মধ্যে সেই এক আত্মাকে নিজের মধ্যে অনুভব করবার উদার শক্তি যাঁরা পেয়েচেন তাঁদেরই তো বলি মহাত্মা, তাঁরাই তো সর্ব্বমানবের জন্যে প্রাণ দিতে পারেন। তাঁরাই তো এই এক গূঢ় আত্মার প্রতি লক্ষ্য ক'রে বলতে পারেন, **তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদ্**

অন্তরতরং যদয়মাত্মা,—তিনি পুত্রের চেয়ে প্রিয়, বিত্তের চেয়ে প্রিয়, অন্যসকল-হতে প্রিয় এই আত্মা যিনি অন্তরতর।

বৈজ্ঞানিক এই কথা শুনে ধিক্কার দেন, বলেন, দেবতাকে প্রিয় বললে দেবতার প্রতি মানবিকতা আরোপ করা হয়। আমি বলি মানবত্ব আরোপ করা নয় মানবত্ব উপলব্ধি করা। মানুষ আপন মানবিকতারই মাহাত্ম্য-বোধ অবলম্বন ক'রে আপন দেবতায় এসে পৌঁছেচে। মানুষের মন আপন দেবতায় আপন মানবত্বের প্রতিবাদ করতে পারে না। করা তার পক্ষে সত্যই নয়। ঈথরের কম্পনে মানুষ আলোকত্ব আরোপ করে না, তাকে স্বতই আলোকরূপে অনুভব করে, আলোকরূপেই ব্যবহার করে, ক'রে ফল পায়, এও তেমনি।

পরম মানবিক সত্তাকে পেরিয়ে গিয়েও পরম জাগতিক সত্তা আছে। সূর্য্যলোককে ছাড়িয়ে যেমন আছে নক্ষত্রলোক। কিন্তু যার অংশ এই পৃথিবী, যার উত্তাপে পৃথিবীর প্রাণ, যার যোগে পৃথিবীর চলাফেরা, পৃথিবীর দিনরাত্রি, সে একান্তভাবে এই সূর্য্যলোক। জ্ঞানে আমরা নক্ষত্রলোককে জানি কিন্তু জ্ঞানে কর্ম্মে আনন্দে দেহমনে সর্ব্বতোভাবে জানি এই সূর্য্যলোককে। তেমনি জাগতিক ভূমা আমাদের জ্ঞানের বিষয়, মানবিক ভূমা আমাদের সমগ্র দেহমন ও চরিত্রের পরিতৃপ্তি ও

পরিপূর্ণতার বিষয়। আমাদের ধর্মশ্চ কর্ম্ম চ, আমাদের ঋতং সত্যং, আমাদের ভূতং ভবিষ্যৎ সেই সত্তারই অপর্য্যাপ্তিতে।

মানবিক সত্তাকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক জাগতিক সত্তা, তাঁকে প্রিয় বলা বা কোনো কিছুই বলার কোনো অর্থ নেই। তিনি ভালোমন্দ সুন্দর অসুন্দরের ভেদবর্জ্জিত। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে পাপপুণ্যের কথা উঠতে পারে না।। অস্তীতিব্রুবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে। তিনি আছেন এ ছাড়া তাঁকে কিছুই বলা চলে না। মানবমনের সমস্ত লক্ষণ সম্পূর্ণ লোপ ক'রে দিয়ে সেই নির্ব্বিশেষে মগ্ন হওয়া যায় এমন কথা শোনা গেছে। এ নিয়ে তর্ক চলে না। মন-সমেত সমস্ত সত্তার সীমানা কেউ একেবারেই ছাড়িয়ে গেছে কিনা আমাদের মন নিয়ে সে কথা নিশ্চিত বলব কী ক'রে। আমরা সত্তামাত্রকে যে-ভাবে যেখানেই স্বীকার করি সেটা মানুষের মনেরই স্বীকৃতি। এই কারণেই দোষারোপ ক'রে মানুষের মন স্বয়ং যদি তাকে অস্বীকার করে তবে শূন্যতাকেই সত্য বলা ছাড়া উপায় থাকে না। এমন নাস্তিবাদের কথাও মানুষ বলেচে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক তা বললে তার ব্যবসা বন্ধ করতে হয়। বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতায় আমরা যে-জগৎকে জানি বা কোনো কালে জানবার সম্ভাবনা রাখি সেও মানবজগৎ। অর্থাৎ

মানুষের বুদ্ধির, যুক্তির কাঠামোর মধ্যে কেবল মানুষই তাকে আপন চিন্তার আকারে আপন বোধের দ্বারা বিশিষ্টতা দিয়ে অনুভব করে। এমন কোনো চিত্ত কোথাও থাকতেও পারে যার উপলব্ধ জগৎ আমাদের গাণিতিক পরিমাপের অতীত, আমরা যাকে আকাশ বলি সেই আকাশে যে বিরাজ করে না। কিন্তু যে-জগতের গূঢ় তত্ত্বকে মানব আপন অন্তর্নিহিত চিন্তা-প্রণালীর দ্বারা মিলিয়ে পাচ্চে তাকে অতিমানবিক বলব কী ক'রে। এই জন্যে কোনো আধুনিক পণ্ডিত বলেচেন, বিশ্বজগৎ গাণিতিক মনের সৃষ্টি। সেই গাণিতিক মন তো মানুষের মনকে ছাড়িয়ে গেল না। যদি যেত তবে এ জগতের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমরা জানতেই পারতুম না, যেমন কুকুর বিড়াল কিছুতেই জানতে পারে না। যিনি আমাদের দর্শনে শাস্ত্রে সগুণ ব্রহ্ম, তাঁর স্বরূপসম্বন্ধে বলা হয়েচে **সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণা-ভাসম্।** অর্থাৎ মানুষের বহিরিন্দ্রিয় অন্তরিন্দ্রিয়ের যত কিছু গুণ তার আভাস তাঁরই মধ্যে। তার অর্থই এই যে মানবব্রহ্ম, তাই তাঁর জগৎ মানবজগৎ। এ ছাড়া অন্য জগৎ যদি থাকে তাহলে সে আমাদের সম্বন্ধে শুধু যে আজই নেই তা নয়, কোনো কালেই নেই।

এই জগৎকে জানি আপন বোধ দিয়ে। যে-জানে সেই আমার আত্মা। সে আপনাকেও আপনি জানে।

এই স্বপ্রকাশ আত্মা একা নয়। আমার আত্মা, তোমার আত্মা, তার আত্মা এমন কত আত্মা। তারা যে-এক আত্মার মধ্যে সত্য, তাঁকে আমাদের শাস্ত্রে বলেন পরমাত্মা। এই পরমাত্মা মানবপরমাত্মা, ইনি **সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ,** ইনি আছেন সর্ব্বদা জনে জনের হৃদয়ে।

বলা হয়েচে বটে আমাদের সকল ইন্দ্রিয়গুণের আভাস এঁর মধ্যে, কিন্তু এতেই সব কথা শেষ হোলো না। এক-আত্মার সঙ্গে আর-এক আত্মার যে-সম্বন্ধ সকলের চেয়ে নিবিড় সকলের চেয়ে সত্য তাকেই বলে প্রেম। ভৌতিক বিশ্বের সঙ্গে আমাদের বাস্তব পরিচয় ইন্দ্রিয়বোধে, আত্মিক বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সত্য পরিচয় প্রেমে। আত্মিক বিশ্বের পরিচয় মানুষ জন্মমুহূর্ত্তেই আরম্ভ করেচে পিতামাতার প্রেমে। এই-খানে অপরিমেয় রহস্য, অনির্ব্বচনীয়ের সংস্পর্শ। প্রশ্ন উঠল মনে, এই পিতামাতার সত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত। দাল্‌ভ্য যদি উত্তর করেন এই পৃথিবীর মাটিতে, প্রবাহণ মাথা নেড়ে বলবেন যিনি **পিতৃতমঃ পিতৃণাম্‌**, সকল পিতাই যাঁর মধ্যে পিতৃতম হয়ে আছেন তাঁরই মধ্যে। মাটির অর্থ বুঝতে পারি বাহির থেকে তাকে নেড়ে চেড়ে দেখে, পিতামাতার রহস্য বুঝতে পারি আপনারই আত্মার গভীরে এবং সেই গভীরেই উপলব্ধি করি

পিতৃতমকে। সেই পিতৃতম বিশেষ কোনো স্বর্গে নেই, বিশেষ কোনো দেশকালে বদ্ধ ইতিহাসে নেই, ইনি বিশেষ কোনো একটি মানুষে একদা অবতীর্ণ নন, ইনি প্রেমের সম্বন্ধে মানবের ভূতভবিষ্যৎকে পূর্ণ ক'রে আছেন নিখিল মানবলোকে। আহ্বান করচেন দুর্গম পথের ভিতর দিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে, অসত্যের থেকে সত্যের দিকে, অন্ধকার থেকে জ্যোতির দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে দুঃখের মধ্য দিয়ে, তপস্যার মধ্য দিয়ে।

এই আহ্বান মানুষকে কোনো কালে কোথাও থামতে দিলে না, তাকে চিরপথিক ক'রে রেখে দিলে। ক্লান্ত হয়ে যারা পথ ছেড়ে পাকা ক'রে ঘর বেঁধেচে তারা আপন সমাধিঘর রচনা করেচে। মানুষ যথার্থই অনাগারিক। জন্তুরা পেয়েচে বাসা, মানুষ পেয়েচে পথ। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁরা পথনির্ম্মাতা, পথপ্রদর্শক। বুদ্ধকে যখন কোনো একজন লোক চরমতত্ত্বের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি বলেছিলেন আমি চরমের কথা বলতে আসিনি আমি বলব পথের কথা। মানুষ এক-যুগে যাকে আশ্রয় করচে আর-এক যুগে উন্মাদের মতো তার দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে পড়েচে পথে। এই যে বারে বারে ঘর ভেঙে দিয়ে চলবার উদ্দামতা, যার জন্যে সে প্রাণপণ করে, এ প্রমাণ করচে কোন্ সত্যকে। সেই সত্যসম্বন্ধেই

উপনিষদ বলেন, **মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।** তিনি মনকে ইন্দ্রিয়কে ছাড়িয়ে চলে গেছেন। ছাড়িয়ে যদি না যেতেন তবে পদে পদে মানুষও আপনাকে ছাড়িয়ে যেত না। অথর্ব্ব-বেদ বলেচেন এই আরোর দিকে, এই ছাড়িয়ে যাবার দিকে মানুষের শ্রী, তার ঐশ্বর্য্য, তার মহত্ত্ব।

তাই মানবদেবতার সম্বন্ধে এই কথা শুনি :—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং
শ্রীমদ্ উর্জ্জিতমেব বা
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং
মম তেজোঽংশসম্ভবম্।

যা-কিছুতে ঐশ্বর্য্য আছে, শ্রী আছে, শ্রেষ্ঠতা আছে সে আমারই তেজের অংশ থেকে সম্ভূত।

বিশ্বে ছোটো বড়ো নানা পদার্থই আছে। থাকা-মাত্রের যে-দাম তা সকলের পক্ষেই সমান। নিছক অস্তিত্বের আদর্শে মাটির ঢেলার সঙ্গে পদ্মফুলের উৎকর্ষ অপকর্ষের ভেদ নেই। কিন্তু মানুষের মনে এমন একটি মূল্যভেদের আদর্শ আছে, যাতে প্রয়োজনের বিচার নেই, যাতে আয়তনের বা পরিমাণের তৌল চলে না। মানুষের মধ্যে বস্তুর অতীত একটি অহৈতুক পূর্ণতার অনুভূতি আছে, একটা অন্তরতম সার্থকতার বোধ। তাকেই সে বলে শ্রেষ্ঠতা। অথচ এই শ্রেষ্ঠতাসম্বন্ধে মতের

ঐক্য তো দেখিনে। তাহলে সেটা যে নৈর্ব্যক্তিক শাশ্বত সত্যে প্রতিষ্ঠিত এ কথা বলা যায় কী ক'রে।

জ্যোতির্ব্বিদ দূরবীন নিয়ে জ্যোতিষ্কের পর্য্যালোচনা করতে চান, কিন্তু তার বাধা বিস্তর। আকাশে আছে পৃথিবীর ধূলো, বাতাসের আবরণ, বাষ্পের অবগুণ্ঠন, চার দিকে নানা প্রকার চঞ্চলতা। যন্ত্রের ত্রুটিও অসম্ভব নয়, যে-মন দেখচে তার মধ্যে আছে পূর্ব্বসংস্কারের আবিলতা। ভিতর-বাহিরের সমস্ত ব্যাঘাত নিরস্ত করলে বিশুদ্ধ সত্য পাওয়া যায়। সেই বিশুদ্ধ সত্য এক, কিন্তু বাধাগ্রস্ত প্রতীতির বিশেষত্ব অনুসারে ভ্রান্ত মত বহু।

পুরোনো সভ্যতার মাটিচাপা ভাঙাচোরা চিহ্নশেষ উদ্ধার করলে তার মধ্যে দেখা যায় আপন শ্রেষ্ঠতাকে প্রকাশ করবার জন্যে মানুষের প্রভূত প্রয়াস। নিজের মধ্যে যে-কল্পনাকে সকল কালের সকল মানুষের ব'লে সে অনুভব করেচে তারি দ্বারা সর্ব্বকালের কাছে নিজের পরিচয় দিতে তার কত বল, কত কৌশল। ছবিতে মূর্ত্তিতে, ঘরে ব্যবহারের সামগ্রীতে সে ব্যক্তিগত মানুষের খেয়ালকে প্রচার করতে চায়নি, বিশ্বগত মানুষের আনন্দকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্যে তার দুঃসাধ্য সাধনা। মানুষ তাকেই জানে শ্রেষ্ঠতা যাকে সকল কাল ও সকল মানুষ স্বীকার করতে পারে। সেই

শ্রেষ্ঠতার দ্বারা মানুষ আত্মপরিচয় দিয়ে থাকে। অর্থাৎ আপন আত্মায় সকল মানুষের আত্মার পরিচয় দেয়। এই পরিচয়ের সম্পূর্ণতাতেই মানুষের অভ্যুদয়, তার বিকৃতিতেই মানুষের পতন। বাহ্যসম্পদের প্রাচুর্য্যের মাঝখানেই সেই বিনষ্টির লক্ষণ সহসা এসে দেখা দেয় যখন মদান্ধ স্বার্থান্ধ মানুষ চিরমানবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। পাশ্চাত্য মহাদেশে কি সেই লক্ষণ আজ দেখা দেয়নি। সেখানে বিজ্ঞান আছে, বাহুবল আছে, অর্থবল আছে, বুদ্ধিবল আছে কিন্তু তার দ্বারাও মানুষ রক্ষা পায় না। স্বাজাত্যের শিখরের উপরে চ'ড়ে বিশ্বগ্রাসী লোভ যখন মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করতে স্পর্দ্ধা করে, রাষ্ট্রনীতিতে নিষ্ঠুরতা ও ছলনার সীমা থাকে না, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা এবং সংশয় যখন নিদারুণ হিংস্রতায় শান দিতে বসে তখন মানবের ধর্ম্ম আঘাত পায় এবং মানবের ধর্ম্মই মানুষকে ফিরে আঘাত করে। এ কোনো পৌরাণিক ঈশ্বরের আদিষ্ট বিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা নয়। এই সব আত্মম্ভরিরা **আত্মহনো জনাঃ**। এরা সেই আত্মাকে মারে যে-আত্মা স্বদেশের বা স্বগোষ্ঠীর মধ্যে বদ্ধ নয়, যে-আত্মা নিত্যকালের বিশ্বজনের। একলা নিজেকে বা নিজেদেরকে বড়ো করবার চেষ্টায় অন্য সকল প্রাণীরই উন্নতি ঘটতে পারে, তাতে তাদের সত্যদ্রোহ ঘটে না, কিন্তু মানুষের পক্ষে

সেইটেই অসত্য, অধর্ম্ম, এই জন্যে সকলপ্রকার সমৃদ্ধির মাঝখানেই তার দ্বারাই মানুষ "সমূলেন বিনশ্যতি।"

বিশুদ্ধ সত্যের উপলব্ধিতে বিশ্বমানবমনের প্রকাশ, এ কথা স্বীকার করা সহজ, কিন্তু রসের অনুভূতিতে সেই বিশ্বমনকে হৃদয়ঙ্গম করি কিনা এ নিয়ে সংশয় জন্মাতে পারে। সৌন্দর্য্যে আনন্দবোধের আদর্শ দেশ-কালপাত্রভেদে বিচিত্র যদি হয় তবে এর শাশ্বত আদর্শ কোথায়। অথচ বৃহৎ কালে মেলে দিয়ে মানুষের ইতিহাসকে যখন দেখি তখন দেখতে পাই শিল্পসৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠতাসম্বন্ধে সকল কালের সকল সাধকদের মন মেলবার দিকেই যায়। এ কথা সত্য যে নিশ্চিতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই সুন্দর সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ রস পায় না। অনেকের মন রূপকাণা, তাদের ব্যক্তিগত অভিরুচির সঙ্গে বিশ্বরুচির মিল নেই। মানুষের মধ্যে অনেকে আছে স্বভাবতই বিজ্ঞানমূঢ়, বিশ্বসম্বন্ধে তাদের ধারণা মোহাচ্ছন্ন ব'লেই তা বহু, এক-সংস্কারের সঙ্গে আর-এক সংস্কারের মিল হয় না, অথচ নিজ নিজ অন্ধ সংস্কারের সত্যতাসম্বন্ধে তাদের প্রত্যেকের এমন প্রচণ্ড দম্ভ যে তা নিয়ে তারা খুনোখুনি করতেও প্রস্তুত। তেমনি সংসারে স্বভাবতই অরসিক বা বেরসিকের অভাব নেই তাদেরও মতভেদ সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। নিম্নসপ্তক থেকে উচ্চসপ্তক পর্য্যন্ত উদারা মুদারা তারা

নানা পর্য্যায়ের জন্মমূঢ়তা আছে ব'লেই যেমন জ্ঞানের বিশ্বভূমীন সম্পূর্ণতায় অশ্রদ্ধা করা যায় না সৌন্দর্য্যের আদর্শসম্বন্ধেও তেমনি।

বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল কোনো এক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেচেন যে, বেটোভনের সিম্ফনিকে বিশ্বমনের রচনা বলা যায় না, সেটা ব্যক্তিগত। অর্থাৎ সেটা তো গাণিতিক তত্ত্বের মতো নয়, যার উদ্ভাবনাসম্বন্ধে ব্যক্তিগত মন উপলক্ষ্য মাত্র, যা নিখিল মনের সামগ্রী। কিন্তু যদি এ কথা স্বীকার করতে হয় যে বেটোভনের রচনা সকলেরই ভালো লাগা উচিত, অর্থাৎ ঠিকমতো শিক্ষা পেলে, স্বাভাবিক চিত্তজড়তা না থাকলে, অজ্ঞান অনভ্যাসের আবরণ দূর হোলে সকল মানুষের তা ভালো লাগবে, তাহলে বলতেই হবে শ্রেষ্ঠগীত-রচয়িতার শ্রেষ্ঠত্ব সকল মানুষের মনেই সম্পূর্ণ আছে, শ্রোতৃরূপে ব্যক্তিবিশেষের মনে তা বাধাগ্রস্ত।

বুদ্ধি জিনিষটা অস্তিত্বরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য কিন্তু সৌন্দর্য্যবোধের অপূর্ণতাসত্ত্বেও সংসারে সিদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সৌন্দর্য্যবোধের কোনো সাংঘাতিক তাগিদ নেই। এ-সম্বন্ধে যথেচ্ছাচারের কোনো দণ্ডনীয় বাধা নেই। যুক্তি-স্বীকারকারী বুদ্ধি মানুষের মনে যত সুনিশ্চিত হয়েচে প্রাণের বিভাগে শাসনের অভাবে সৌন্দর্য্যস্বীকারকারী রুচি তেমন পাকা

হয়নি। তবু সমস্ত মানবসমাজে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির কাজে মানুষের যত প্রভূত শক্তির প্রয়োগ হচ্চে এমন অল্প বিষয়েই। অথচ জীবনধারণে এর প্রয়োজন নেই, এর প্রয়োজন আত্মিক। অর্থাৎ এর দ্বারা বাইরের জিনিষকে পাইনে অন্তরের দিক থেকে দীপ্তিমান হই, পরিতৃপ্ত হই। এই পরিতৃপ্ত হওয়ার দ্বারা যাঁকে জানি তাঁকে বলি রসো বৈ সঃ।

এই হওয়ার দ্বারা পাওয়ার কথা উপনিষদে বারবার শোনা যায়, তার থেকে এই বুঝি, মানুষের যা চরম পাবার বিষয় তার সঙ্গে মানুষ একাত্মক, মানুষ তারই মধ্যে সত্য, কেবল তার বোধের বাধা আছে।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্
নাশান্তো নাসমাহিতঃ
নাশান্তো মানসো বাপি
প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।

বলচেন, কেবল জানার দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। হওয়ার দ্বারা পেতে হবে, দুশ্চরিত থেকে বিরত হওয়া, সমাহিত হওয়া, রিপুদমন ক'রে অচঞ্চলমন হওয়া দ্বারাই তাঁকে পেতে হবে। অর্থাৎ এ এমন পাওয়া যা আপনারই চিরন্তন সত্যকে পাওয়া।

পূর্ব্বে বলেচি ভৌতিক সত্যকে বিশুদ্ধ ক'রে দেখতে গেলে কাছের সমস্ত মলিনতা ও চাঞ্চল্য, ব্যক্তিগত

সমস্ত বিকার দূর করা চাই। আত্মিক সত্যসম্বন্ধে সে কথা আরো বেশি খাটে। যখন পশুসত্তার বিকার আমরা আত্মিক সত্যে আরোপ করি তখন সেই প্রমাদ সব চেয়ে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। কেননা, তখন আমাদের হওয়ার ভিত্তিতেই লাগে আঘাত। জানার ভুলের চেয়ে হওয়ার ভুল কত সর্ব্বনেশে তা বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই বিজ্ঞানের সাহায্যে যে-শক্তিকে আমরা আয়ত্ত করেচি সেই শক্তিই মানুষের হিংসা ও লোভের বাহন হয়ে তার আত্মঘাতকে বিস্তার করচে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এই জন্যেই সম্প্রদায়ের নামে ব্যক্তিগত বা বিশেষ জনগত স্বভাবের বিকৃতি মানুষের পাপবুদ্ধিকে যত প্রশ্রয় দেয় এমন বৈজ্ঞানিক ভ্রান্তিতে কিংবা বৈষয়িক বিরোধেও না। সাম্প্রদায়িক দেবতা তখন বিদ্বেষবুদ্ধির, অহঙ্কারের, অবজ্ঞাপরতার, মূঢ়তার দৃঢ় আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়, শ্রেয়ের নামাঙ্কিত পতাকা নিয়ে অশ্রেয় জগদ্ব্যাপী অশান্তির প্রবর্ত্তন করে,—স্বয়ং দেবত্ব অবমানিত হয়ে মানুষকে অবমানিত ও পরস্পরব্যবহারে আতঙ্কিত ক'রে রাখে। আমাদের দেশে এই দুর্য্যোগ আমাদের শক্তি ও সৌভাগ্যের মূলে আঘাত করচে।

অন্য দেশেও তার দৃষ্টান্ত আছে। সাম্প্রদায়িক খৃষ্টান ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক দেবচরিত্রে পূজাবিধিতে

চরিত্রবিকৃতি বা হিংস্রতা দেখে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। সংস্কারবশত দেখতে পান না মানুষের আপন অহিতবুদ্ধি তাঁদেরও দেবতার ধারণাকে কীরকম নিদারুণভাবে অধিকার করতে পারে। অপ্‌সুদীক্ষা বা ব্যাপ্টিজ্‌ম্‌ হবার পূর্ব্বে কোনো শিশুর মৃত্যু হোলে যে-সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রমতে তার অনন্ত নরকবাস বিহিত হতে পারে সেই শাস্ত্রমতে দেবচরিত্রে যে অপরিসীম নির্দ্দয়তার আরোপ করা হয় তার তুলনা কোথায় আছে। বস্তুত যে-কোনো পাপের প্রসঙ্গেই হোক অনন্ত নরকের কল্পনা হিংস্রবুদ্ধির চরম প্রকাশ। য়ুরোপে মধ্যযুগে শাস্ত্রগত ধর্ম্মবিশ্বাসকে অবিচলিত রাখবার জন্যে যে-বিজ্ঞানবিদ্বেষী ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ উৎপীড়ন আচরিত, তার ভিত্তি এইখানে। সেই নরকের আদর্শ সভ্যমানুষের জেলখানায় আজো বিভীষিকা বিস্তার ক'রে আছে। সেখানে শোধন করবার নীতি নেই, আছে শাসন করবার হিংস্রতা।

মনুষ্যত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেবতার উপলব্ধি মোহমুক্ত হতে থাকে, অন্তত হওয়া উচিত। হয় না যে তার কারণ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সব কিছুকেই আমরা নিত্য ব'লে ধরে নিয়েচি। ভুলে যাই যে, ধর্ম্মের নিত্য আদর্শকে শ্রদ্ধা করি ব'লেই ধর্ম্মমতকেও নিত্য ব'লে স্বীকার করতে হবে এমন কথা বলা চলে না। ভৌতিক বিজ্ঞানের মূলে নিত্য সত্য আছে ব'লেই বৈজ্ঞানিক মত মাত্রই নিত্য

এমন গোঁড়ামির কথা যদি বলি তাহলে আজও বলতে হবে সূর্য্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করচে। ধর্ম্মসম্বন্ধে সাধারণত এই ভুলই ঘটে, সম্প্রদায় আপন মতকেই বলে ধর্ম্ম, আর ধর্ম্মকেই করে আঘাত। তারপরে যে বিবাদ, যে নির্দ্দয়তা, যে বুদ্ধিবিচারহীন অন্ধসংস্কারের প্রবর্ত্তন হয় মানুষের জীবনে আর কোনো বিভাগে তার তুলনাই পাওয়া যায় না।

এ কথা মানতে হবে ভুল মত মানুষেরই আছে জন্তুর নেই। আদিম কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত ভুলমতবাদের উদ্ভব হচ্চে, যে হেতু মানুষের একটা দুর্নিবার সমগ্রতার বোধ আছে। কোনো একটা তথ্য যখন স্বতন্ত্রভাবে বিচ্ছিন্নভাবে তার সামনে আসে তখন তাকেই সম্যক ব'লে সে স্বীকার ক'রে নিতে পারে না। তাকে পূর্ণ করবার আগ্রহে কল্পনার আশ্রয় নেয়। সেই কল্পনা প্রকৃতিভেদে মূঢ় বা প্রাজ্ঞ, সুন্দর বা কুৎসিত, নিষ্ঠুর বা সকরুণ নানা প্রকার হতে পারে। কিন্তু মূল কথাটা হচ্চে তার এই বিশ্বাস যে, প্রত্যক্ষ বিচ্ছিন্নতাকে পরিপূর্ণ ক'রে আছে অপ্রত্যক্ষ নিখিলতার সত্য। সমগ্রকে উপলব্ধি করবার যে প্রেরণা আছে তার মনে, সেই তার ভূমার বোধ।

মানুষ অন্তরে বাহিরে অনুভব করে সে আছে একটি নিখিলের মধ্যে। সেই নিখিলের সঙ্গে সচেতন

সচেষ্ট যোগসাধনের দ্বারাই সে আপনাকে সত্য ক'রে জানতে থাকে। বাহিরের যোগে তার সমৃদ্ধি, ভিতরের যোগে তার সার্থকতা।

আমাদের ভৌতিক দেহ স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। পৃথিবীর মাটি জল বাতাস উত্তাপ, পৃথিবীর ওজন আয়তন গতি সমস্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যে এই শরীর; কোথাও তার সঙ্গে এর একান্ত ছেদ নেই। বলা যেতে পারে পৃথিবী মানুষের পরম দেহ, সাধনার দ্বারা যোগবিস্তারের দ্বারা এই বিরাটকে মানুষ আপন ক'রে তুলচে, বড়ো দেহের মধ্যে ছোটো দেহকে প্রসারিত করচে, বিশ্বভৌতিক শক্তিকে আয়ত্ত ক'রে পরিমিত দেহের কর্ম্মশক্তিকে পরিপূর্ণ করেচে, চোখ স্পষ্টতর ক'রে দেখচে সুদূরস্থ মহীয়ান ও নিকটস্থ কনীয়ানকে; দুই হাত পাচ্চে বহুসহস্র হাতের শক্তি, দেশের দূরত্ব সঙ্কীর্ণ হয়ে আমাদের দেহের নিকটবর্ত্তী হচ্চে। একদিন সমস্ত ভৌতিক শক্তি দেহশক্তির পরিশিষ্ট হয়ে উঠবে মানুষের এই সঙ্কল্প।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ
সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোঁকে
সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।

এই বাণীকে নিজের মধ্যে সার্থক করবে সেই

স্পর্দ্ধা নিয়ে মানুষ অগ্রসর। একেবারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে তা নয়, নিজের দেহশক্তির সঙ্গে বিরাট ভৌতিক শক্তির সংযোগকে উত্তরতর ক'রে তুলবে।

মনে করা যাক সবই হোলো, ভৌতিক শক্তির পূর্ণতাই ঘটল। তবু কি মানুষ বলতে ছাড়বে ততঃ কিম্। রামায়ণে বর্ণিত দশাননের শরীরে মানবের স্বভাবসিদ্ধ দেহশক্তি বহুগুণিত হয়েছিল, দশদিক থেকে আহরিত ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হয়েছিল স্বর্ণলঙ্কাপুরী। কিন্তু মহাকাব্যে শেষ জায়গাটা সে পেল না। তার পরাভব হোলো রামচন্দ্রের কাছে। অর্থাৎ বাহিরে যে দরিদ্র, আত্মায় যে ঐশ্বর্য্যবান, তার কাছে। সংসারে এই পরাভব আমরা যে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ ক'রে থাকি তা নয়, অনেক সময়ে তার বিপরীত দেখি, তবু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মানুষ এ'কে পরাভব বলে। মানুষের আর একটা গূঢ় জগৎ আছে সেইখানেই এই পরাভবের অর্থ পাওয়া যায়। সেই হোলো তার আত্মার জগৎ।

আপন সত্তার পরিচয়ে মানুষের ভাষায় দুটি নাম আছে। একটি অহং, আর-একটি আত্মা। প্রদীপের সঙ্গে একটিকে তুলনা করা যায় আর-একটিকে শিখার সঙ্গে। প্রদীপ আপনার তেল সংগ্রহ করে। আপনার উপাদান নিয়ে প্রদীপের বাজারদর, কোনোটার দর

সোনার, কোনোটার মাটির। শিখা আপনাকেই প্রকাশ করে, এবং তারি প্রকাশে আর সমস্তও প্রকাশিত। প্রদীপের সীমাকে উত্তীর্ণ হয়ে সে প্রবেশ করে নিখিলের মধ্যে।

মানুষের আলো জ্বালায় তার আত্মা, তখন ছোটো হয়ে যায় তার সঞ্চয়ের অহঙ্কার। জ্ঞানে প্রেমে ভাবে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্তি-দ্বারাই সার্থক হয় সেই আত্মা। সেই যোগের বাধাতেই তার অপকর্ষ। জ্ঞানের যোগে বিকার ঘটায় মোহ, ভাবের যোগে অহঙ্কার, কর্ম্মের যোগে লোভ স্বার্থপরতা। ভৌতিক বিশ্বে সত্য আপন সর্ব্বব্যাপক ঐক্য প্রমাণ করে, সেই ঐক্য-উপলব্ধিতে আনন্দিত হয় বৈজ্ঞানিক। তেমনি আত্মার আনন্দ আত্মিক ঐক্যকে উপলব্ধি-দ্বারা, যে-আত্মার সম্বন্ধে উপনিষদ বলেচেন, **তমেবৈকং জানথ আত্মানম্** —সেই আত্মাকে জানো সেই এককে, যাকে সকল আত্মার মধ্যে এক ক'রে জানলে সত্যকে জানা হয়। প্রার্থনামন্ত্রে আছে, **য একঃ** যিনি এক, **স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু**,—শুভবুদ্ধির দ্বারা তিনি আমাদের সকলকে এক ক'রে দিন। যে-বুদ্ধিতে আমরা সকলে মিলি সেই বুদ্ধিই শুভবুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই আত্মার।

যথৈবাত্মা পরস্তদ্বদ্ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা,
—আপনার মতো ক'রে পরকে দেখার ইচ্ছাকেই বলে

শুভ ইচ্ছা, সিদ্ধিলোভেও শুভ নয় পুণ্যলোভেও শুভ নয়। পরের মধ্যে আপন চৈতন্যের প্রসারণেই শুভ কেননা পরম মানবাত্মার মধ্যেই আত্মা সত্য।

সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্
তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ—

যে-হেতু ভগবান সর্ব্বগত, সকলকে নিয়ে আছেন সেই জন্যেই তিনি শিব। সমগ্রের মধ্যেই শিব, শিব ঐক্য-বন্ধনে। আচারীরা সামাজিক কৃত্রিম বিধির দ্বারা যখন খণ্ডতার সৃষ্টি করে তখন কল্যাণকে হারায়, তার পরিবর্ত্তে যে-কাল্পনিক পদার্থ দিয়ে আপনাকে ভোলায় তার নাম দিয়েচে পুণ্য। সেই পুণ্য আর যাই হোক সে শিব নয়। সেই সমাজবিধি আত্মার ধর্ম্মকে পীড়িত করে। স্বলক্ষণন্তু যো বেদ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে। আত্মার লক্ষণকে যে জানে সেই মুনি সেই শ্রেষ্ঠ। আত্মার লক্ষণ হচ্চে শুভবুদ্ধি, যে-শুভবুদ্ধিতে সকলকে এক করে।

পৃথিবী আপনাতে আপনি আবর্ত্তিত, আবার বৃহৎ কক্ষপথে সে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করচে। মানুষের সমাজেও যা-কিছু চলচে সেও এই দুই রকমের বেগে। এক দিকে ব্যক্তিগত আমি-র টানে ধনসম্পদপ্রভুত্বের আয়োজন পুঞ্জিত হয়ে উঠচে আর-এক দিকে অমিতমানবের প্রেরণায় পরস্পরের সঙ্গে তার কর্ম্মের যোগ, তার

আনন্দের যোগ, পরস্পরের উদ্দেশে ত্যাগ। এইখানে আত্মার লক্ষণকে স্বীকার করার দ্বারাই তার শ্রেষ্ঠতার উপলব্ধি। উভয়ের মধ্যে পাশাপাশি কীরকম বিপরীত অসঙ্গতি দেখা যায় একটা তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনের টাইম্‌স পত্রে একটি সংবাদ বেরিয়েছিল, আমেরিকার নেশন পত্র থেকে তার বিবরণ পেয়েচি। বায়ুপোতে চ'ড়ে ব্রিটিশ বায়ুনাবিক-সৈন্য আফগানিস্থানে মাহ্‌সুদ্‌ গ্রাম ধ্বংস করতে লেগেছিল। শতঘ্নীবর্ষিণী একটা বায়ুতরী বিকল হয়ে গ্রামের মাঝখানে গেল পড়ে। একজন আফগান মেয়ে নাবিকদের নিয়ে গেল নিকটবর্ত্তী গুহার মধ্যে, একজন মালিক তাদের রক্ষার জন্যে গুহার দ্বার আগলিয়ে রইল। চল্লিশজন ছুরি আস্ফালন ক'রে তাদের আক্রমণ করতে উদ্যত, মালিক তাদের ঠেকিয়ে রাখলে। তখনো উপর থেকে বোমা পড়চে, ভিড়ের লোক ঠেলাঠেলি করচে গুহায় আশ্রয় নেবার জন্যে। নিকটবর্ত্তী স্থানের অন্য কয়েকজন মালিক এবং একজন মোল্লা এদের আনুকূল্যে প্রবৃত্ত হোলো। মেয়েরা কেউ কেউ নিলে এদের আহারের ভার। অবশেষে কিছু দিন পরে মাহ্‌সুদের ছদ্মবেশ পরিয়ে এরা তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিল।

এই ঘটনার মধ্যে মানবস্বভাবের দুই বিপরীত দিক

চূড়ান্তভাবেই দেখা দিয়েচে। এরোপ্লেন থেকে বোমা-বর্ষণে দেখা যায় মানুষের শক্তির আশ্চর্য্য সমৃদ্ধি, ভূতল থেকে নভস্তল পর্য্যন্ত তার সশস্ত্র বাহুর বিপুল বিস্তার। আবার হননে প্রবৃত্ত শত্রুকে ক্ষমা ক'রে তাকে রক্ষা করতে পারল মানুষের এই আর এক পরিচয়। শত্রু-হননের সহজ প্রবৃত্তি মানুষের জীবধর্ম্মে, তাকে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ অদ্ভুত কথা বললে, শত্রুকে ক্ষমা করো। এ কথাটা জীবধর্ম্মের হানিকর কিন্তু মানবধর্ম্মের উৎকর্ষ-লক্ষণ।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে, যুদ্ধকালে যে-মানুষ রথে নেই যে আছে ভূতলে, রথী তাকে মারবে না। যে ক্লীব, যে কৃতাঞ্জলি, যে মুক্তকেশ, যে আসীন, যে সানুনয়ে বলে আমি তোমারি তাকেও মারবে না। যে ঘুমচ্চে, যে বর্ম্মহীন, যে নগ্ন, যে নিরস্ত্র, যে অযুধ্যমান, যে যুদ্ধ দেখচে মাত্র, যে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত তাকেও মারবে না। যার অস্ত্র গেছে ভেঙে, যে শোকার্ত্ত, যে পরিক্ষত, যে ভীত, যে পরাবৃত্ত, সতের ধর্ম্ম অনুস্মরণ ক'রে তাকেও মারবে না।

সতের ধর্ম্ম বলতে বোঝায় মানুষের মধ্যে যে সত্য তারই ধর্ম্ম, মানুষের মধ্যে যে মহৎ, তাঁরই ধর্ম্ম। যুদ্ধ করতে গিয়ে মানুষ যদি তাঁকে অস্বীকার করে তবে ছোটো দিকে তার জিৎ হোলেও বড়ো দিকে তার হার।

উপকরণের দিকে তার সিদ্ধি, অমৃতের দিকে সে বঞ্চিত, এই অমৃতের আদর্শ মাপজোখের বাইরে।

স্বর্ণলঙ্কার মাপজোখ চলে। দশাননের মুণ্ড ও হাত গণনা ক'রে বিস্মিত হবার কথা। তার অক্ষৌহিণী সেনারও সংখ্যা আছে, জয়বিস্তারের পরিধি-দ্বারা সেই সেনার শক্তিও পরিমেয়। আত্মার মহিমার পরিমাণ নেই। শত্রুকে নিধনের পরিমাপ আছে শত্রুকে ক্ষমার পরিমাপ নেই। আত্মা যে-মহার্ঘ্যতায় আপন পরিচয় দেয় ও পরিচয় পায় সেই পরিচয়ের সত্য কি বিরাজ করে না অপরিমেয়ের মধ্যে, যাকে অথর্ব্ববেদ বলেচেন সকল সীমার উদ্বৃত্ত, সকল শেষের উৎশেষ। সে কি এমন একটি স্বয়ম্ভুব বুদ্বুদ কোনো সমুদ্রের সঙ্গে যার কোনো যোগ নেই। মানুষের কাছে শুনেচি, **ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ**—তোমার প্রতি পাপ যে করে তার প্রতি ফিরে পাপ কোরো না। কথাটাকে ব্যবহারে ব্যক্তিবিশেষ মানে বা নাই মানে তবু মন তাকে পাগলের প্রলাপ ব'লে হেসে ওঠে না। মানুষের জীবনে এর স্বীকৃতি দৈবাৎ দেখি, প্রায় দেখি বিরুদ্ধতা, অর্থাৎ মাথা গণ্‌তি ক'রে এর সত্য চোখে পড়ে না বললেই হয়। তবে এর সত্যতা কোন্‌খানে। মানুষের যে স্বভাবে এটা আছে তার আশ্রয় কোথায়। মানুষ এ প্রশ্নের কী উত্তর দিয়েচে শুনি।

যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ
কল্যাণে চ নিবেশিতঃ
তেন সর্ব্বমিদং বুদ্ধং
প্রকৃতির্ব্বিকৃতিশ্চ যা।

আত্মা যাঁর পাপ থেকে বিরত ও কল্যাণে নিবিষ্ট, তিনি সমস্তকে বুঝেচেন। তাই তিনি জানেন কোন্‌টা স্বভাবসিদ্ধ কোন্‌টা স্বভাববিরুদ্ধ।

মানুষ আপনার স্বভাবকে তখনি জানে যখন পাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে কল্যাণের অর্থাৎ সর্ব্বজনের হিত-সাধনা করে। অর্থাৎ মানুষের স্বভাবকে জানে মানুষের মধ্যে যারা মহাপুরুষ। জানে কী ক'রে। **তেন সর্ব্বমিদং বুদ্ধম্।** স্বচ্ছমন নিয়ে সমস্তটাকে সে বোঝে। সত্য আছে শিব আছে সমগ্রের মধ্যে। যে পাপ অহংসীমাবদ্ধ স্বভাবের, তার থেকে বিরত হোলে তবে মানুষ আপনার আত্মিক সমগ্রকে জানে, তখনি জানে আপনার প্রকৃতি। তার এই প্রকৃতি কেবল আপনাকে নিয়ে নয়, তাঁকেই নিয়ে যাঁকে গীতা বলচেন তিনিই **পৌরুষং নৃষু,** মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব। মানুষ এই পৌরুষের প্রতিই লক্ষ্য ক'রে বলতে পারে **ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোক-ত্রয়ং জিতম্।** মৃত্যুতে সেই পৌরুষকে সে প্রমাণ করে যা তার দেবত্বের লক্ষণ, যা মৃত্যুর অতীত।

শ্রেয় প্রেয় নিয়ে এতক্ষণ যা বলা হোলো সেটা সমাজস্থিতির দিক দিয়ে নয়। নিন্দা প্রশংসার ভিত্তিতে পাকা ক'রে গেঁথে শাসনের দ্বারা উপদেশের দ্বারা আত্মরক্ষার উদ্দেশে সমাজ যে-ব্যবস্থা ক'রে থাকে তাতে চিরন্তন শ্রেয়োধর্ম্ম গৌণ, প্রথাঘটিত সমাজরক্ষাই মুখ্য। তাই এমন কথা শোনা যায় শ্রেয়োধর্ম্মকে বিশুদ্ধভাবে সমাজে প্রবর্ত্তন করা ক্ষতিকর। প্রায়ই বলা হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে ভূরিপরিমাণ মূঢ়তা আছে এই জন্যে অনিষ্ট থেকে ঠেকিয়ে রাখতে হোলে মোহের দ্বারাও তাদের মন ভোলানো চাই, মিথ্যা উপায়েও তাদের ভয় দেখানো বা সান্ত্বনা দেওয়া দরকার, তাদের সঙ্গে এমন ভাবে ব্যবহার করা দরকার, যেন তারা চিরশিশু বা চিরপশু। ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েও যেমন সমাজেও তেমনি, কোনো এক পূর্ব্বতনকালে যে সমস্ত মত ও প্রথা প্রচলিত ছিল সেগুলি পরবর্ত্তীকালেও আপন অধিকার ছাড়তে চায় না। পতঙ্গমহলে দেখা যায় কোনো কোনো নিরীহ পতঙ্গ ভীষণ পতঙ্গের ছদ্মবেশে নিজেকে বাঁচায়। সমাজরীতিও তেমনি। তা নিত্যধর্ম্মের ছদ্মবেশে আপনাকে প্রবল ও স্থায়ী করতে চেষ্টা করে। এক দিকে তার পবিত্রতার বাহ্যাড়ম্বর, অন্য দিকে পারত্রিক দুর্গতির বিভীষিকা, সেই সঙ্গে সম্মিলিত শাসনের নানাবিধ কঠোর, এমন

কি, অন্যায় প্রণালী,—ঘর-গড়া নরকের তর্জ্জনীসঙ্কেতে নিরর্থক অন্ধ আচারের প্রবর্ত্তন। রাষ্ট্রতন্ত্রে এই বুদ্ধিরই প্রতীক আণ্ডামান, ফ্রান্সের ডেভিল আইলাণ্ড, ইটালির লিপারি দ্বীপ। এদের ভিতরের কথা এই যে, বিশুদ্ধ শ্রেয়োনীতি ও লোকস্থিতি এক তালে চলতে পারে না। এই বুদ্ধির সঙ্গে চিরদিনই তাঁদের লড়াই চ'লে এসেচে যাঁরা সত্যকে শ্রেয়কে মনুষ্যত্বকে চরম লক্ষ্য ব'লে শ্রদ্ধা করেন।

রাজ্যের বা সমাজের উপযোগিতারূপে শ্রেয়ের মূল্য-বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। শ্রেয়কে মানুষ যে স্বীকার করেচে সেই স্বীকৃতির আশ্রয় কোথায়, সত্য কোথায় সেইটেই আমার আলোচ্য। রাজ্যে সমাজে নানাপ্রকার স্বার্থসাধনের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের ব্যবহারে তার প্রতিবাদ পদে পদে, তবুও আত্মপরিচয়ে মানুষ তাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েচে, তাকেই বলেচে ধর্ম্ম অর্থাৎ নিজের চরম স্বভাব, শ্রেয়ের আদর্শসম্বন্ধে দেশকালপাত্রভেদে যথেষ্ট মতভেদ সত্ত্বেও সেই শ্রেয়ের সত্যকে সকল মানুষই শ্রদ্ধা করেচে এইটেতে মানুষের ধর্ম্মের কোন্ স্বরূপ প্রমাণিত হয় সেইটে আমি বিচার করেচি। হয় এবং হওয়া উচিত এই দ্বন্দ্ব মানব-ইতিহাসের আরম্ভ-কাল থেকেই প্রবলবেগে চলচে, তার কারণ বিচার করতে গিয়ে বলেচি মানুষের অন্তরে এক দিকে পরমমানব

আর এক দিকে স্বার্থসীমাবদ্ধ জীবমানব, এই উভয়ের সামঞ্জস্য-চেষ্টাই মানবমনের নানা অবস্থা অনুসারে নানা আকারে প্রকারে ধর্মতন্ত্ররূপে অভিব্যক্ত। নইলে কেবল সুবিধা অসুবিধা প্রিয় অপ্রিয় প্রবল থাকত জৈবিক ক্ষেত্রে জীবধর্মে ; পাপ পুণ্য কল্যাণ অকল্যাণের কোনো অর্থই থাকত না।

মানুষের এই যে কল্যাণের মতি এর সত্য কোথায় ? ক্ষুধাতৃষ্ণার মতো প্রথম থেকেই আমাদের মনে তার বোধ যদি পূর্ণ থাকত তাহলে তার সাধনা করতে হ'ত না। বলব বিশ্বমানবমনে আছে। কিন্তু সকল মানুষের মন সমষ্টীভূত হয়ে বিশ্বমানবমনের মহাদেশ সৃষ্ট, এ কথা বলব না। ব্যক্তিমন বিশ্বমনে আশ্রিত কিন্তু ব্যক্তিমনের যোগফল বিশ্বমন নয়। তাই যদি হ'ত তাহলে যা আছে তাই হ'ত একান্ত, যা হতে পারে তার জায়গা পাওয়া যেত না। অথচ যা হয়নি, যা হ'তে পারে মানুষের ইতিহাসে তারি জোর তারি দাবী বেশি। তারি আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার হয়ে মানুষের সভ্যতাকে যুগে যুগে বর্তমানের সীমা পার করিয়ে দিচ্চে। সেই আকাঙ্ক্ষা শিথিল হোলেই সত্যের অভাবে সমাজ শ্রীহীন হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে আমার ব্যক্তিগত মনে সুখদুঃখের যে-অনুভূতি সেটা বিশ্বমনের মধ্যেও সত্য কিনা। ভেবে দেখলে দেখা যায় অহংসীমার মধ্যে যে সুখদুঃখ, আত্মার

সীমায় তার রূপান্তর ঘটে। যে মানুষ সত্যের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেচে দেশের জন্যে, লোকহিতের জন্যে,— বৃহৎ ভূমিকায় যে নিজেকে দেখচে, ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অর্থ তার কাছে উল্‌টো হয়ে গেছে। সে মানুষ সহজেই সুখকে ত্যাগ করতে পারে এবং দুঃখকে স্বীকার ক'রে দুঃখকে অতিক্রম করে। স্বার্থের জীবনযাত্রায় সুখ-দুঃখের ভার গুরুতর, মানুষ স্বার্থকে যখন ছাড়িয়ে যায় তখন তার ভার এত হাল্‌কা হয়ে যায় যে, তখন পরম দুঃখের মধ্যে তার সহিষ্ণুতাকে পরম অপমানের আঘাতে তার ক্ষমাকে অলৌকিক ব'লে মনে হয়। আপনাকে বৃহতে উপলব্ধি করাই সত্য, অহংসীমায় অবরুদ্ধ জানাই অসত্য। ব্যক্তিগত দুঃখ এই অসত্যে।

আমরা দুঃখকে যে ভাবে দেখি বৃহতের মধ্যে সে ভাব থাকতে পারে না, যদি থাকত তাহলে সেখানে দুঃখের লাঘব বা অবসান হ'ত না। সঙ্গীতের অসম্পূর্ণতায় বিস্তর বেসুর আছে, সেই বেসুরের একটিও থাকতে পারে না সম্পূর্ণ সঙ্গীতে—সেই সম্পূর্ণ সঙ্গীতের দিকে যতই যাওয়া যায় ততই বেসুরের হ্রাস হ'তে থাকে। বেসুর আমাদের পীড়া দেয়, যদি না দিত তাহলে সুরের দিকে আমাদের যাত্রা এগোত না। তাই বিরাটকে বলি রুদ্র, তিনি মুক্তির দিকে আকর্ষণ করেন দুঃখের পথে। অসর্ণতাকে ক্ষয় করার দ্বারা পূর্ণের সঙ্গে মিলন

বিশুদ্ধ আনন্দময় হবে এই অভিপ্রায় আছে বিশ্বমানবের মধ্যে। তাঁর প্রতি প্রেমকে জাগরিত ক'রে তাঁরই প্রেমকে সার্থক করব যুগে যুগে এই প্রতীক্ষার আহ্বান আসচে আমাদের কাছে।

সেই আহ্বানের আকর্ষণে মানুষ বেরিয়ে পড়েচে অজানার দিকে, এই যাত্রার ইতিহাসই তার ইতিহাস। তার চলার পথপার্শ্বে কত সাম্রাজ্য উঠল এবং পড়ল, ধনসম্পদ হোলো স্তূপাকৃত আবার গেল মিলিয়ে ধূলোর মধ্যে। তার আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্যে কত প্রতিমা সে গড়ে তুললে আবার ভেঙে দিয়ে গেল, বয়স পেরিয়ে ছেলে-বেলাকার খেলনার মতো। কত মায়ামন্ত্রের চাবি বানাবার চেষ্টা করলে, তাই দিয়ে খুলতে চেয়েছিল প্রকৃতির রহস্যভাণ্ডার, আবার সমস্ত ফেলে দিয়ে নূতন ক'রে খুঁজতে বেরিয়েচে গহনে প্রবেশের গোপন পথ,— এমনি ক'রে তার ইতিবৃত্তে এক যুগের পর আর এক যুগ আসচে, মানুষ অশ্রান্ত যাত্রা করেচে অন্নবস্ত্রের জন্যে নয়, আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে মানবলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে, আপনার জটিল বাধার থেকে আপনার অন্তরতম সত্যকে উদ্ধার করবার জন্যে; সেই সত্য যা তার পুঞ্জিত দ্রব্যভারের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত কৃতকর্ম্মের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত প্রথামত বিশ্বাসের চেয়ে বড়ো, যার মৃত্যু নেই, যার ক্ষয়

নেই। প্রভূত হয়েচে মানুষের ভুলভ্রান্তি নিষ্ফলতা, পথে পথে তারা প্রকাণ্ড ভগ্নস্তূপরূপে ছড়িয়ে আছে; মানুষের দুঃখ ব্যথার আঘাত হয়েচে অপরিসীম, তারা অবরুদ্ধ সার্থকতার শৃঙ্খল-ছেদনের কঠিন অধ্যবসায়, এ সমস্ত এক মুহূর্ত্তও কে সহ্য করতে পারত মানুষের অন্তরবাসী ভূমার মধ্যে যদি এর চিরন্তন কোনো অর্থ না থাকত। মানুষের সকল দুঃখের উপরকার কথা এই যে, মানুষ আপন চৈতন্যকে প্রসারিত করচে আপন অসীমের দিকে, জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে বৃহত্তর ঐক্যকে আয়ত্ত করতে চলেচে, আপনার সকল মহৎ কীর্ত্তিতে তাঁর নিকটতর সামীপ্য পাবার জন্যে ব্যগ্র বাহু বাড়িয়েচে যাঁকে **তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি।** মানুষ হয়ে জন্মলাভ ক'রে আরাম চাইবে কে, বিশ্রাম পাব কোথায়, মুক্তি পেতে হবে মুক্তি দিতে হবে এই যে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—

> মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
> নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা,
> মৃত্যুরে না করি' শঙ্কা। দুর্দ্দিনের অশ্রুজলধারা
> মস্তকে পড়িবে ঝরি', তারি মাঝে যাব অভিসারে
> তারি কাছে, জীবনসর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
> জন্ম জন্ম ধরি'।

কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে,
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে,
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি। শুধু জানি যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে,
সঙ্কট-আবর্ত্তমাঝে দিয়েছে সে সর্ব্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্ব্বপ্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোমহুতাশন।

শুনিয়াছি তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর।

তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ।

শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জ্জিতে হইবে জীবনের সর্ব্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নতমস্তক উচ্চে তুলি',
যে-মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্কতিলক।

মানুষের ধর্ম্ম

তিন

বৃহদারণ্যকে একটি আশ্চর্য্য বাণী আছে :—

> অথ যোঽন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে
> অন্যোঽসৌ অন্যোঽহম্ অস্মীতি
> ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম্।

—যে মানুষ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, সেই দেবতা অন্য আর আমি অন্য এমন কথা ভাবে সে তো দেবতাদের পশুর মতোই।

অর্থাৎ সেই দেবতার কল্পনা মানুষকে আপনার বাইরে বন্দী করে রাখে ; তখন মানুষ আপন দেবতার দ্বারাই আপন আত্মা হতে নির্ব্বাসিত অপমানিত।

এই যেমন শোনা গেল উপনিষদে আবার সেই কথাই আপন ভাষায় বলচে নিরক্ষর অশাস্ত্রজ্ঞ বাউল। সে আপন দেবতাকে জানে আপনার মধ্যেই, তাকে বলে মনের মানুষ। বলে "মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।"

মানুষের ইতিহাসে এমন অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েচে যারা কাঠ পাথর পূজাকে বলেচে হীনতা

এবং তাই নিয়ে তারা মারকাট করতে ছোটে। স্বীকার করি কাঠ পাথর বাইরের জিনিষ, সেখানে সর্ব্বকালের সর্ব্বমানুষের পূজা মিলতে পারে না। মানুষের ভক্তিকে জাতিতে জাতিতে প্রথায় প্রথায় সেই পূজা বিচ্ছিন্ন করে, তার ঐতিহাসিক গণ্ডীগুলি সঙ্কীর্ণ।

কিন্তু তাদের বিরুদ্ধ সম্প্রদায়েরও দেবতা প্রতিমার মতোই বাইরে অবস্থিত, নানা প্রকার অমানুষিক বিশেষণে লক্ষণে সজ্জিত, শুধু তাই নয়, বিশেষ জাতির ঐতিহাসিক কার্য্যকলাপে জড়িত ও কাল্পনিক কাহিনী-দ্বারা দৈশিক ও কালিক বিশেষত্বগ্রস্ত। এই পৌত্তলিকতা সূক্ষ্মতর উপাদানে রচিত ব'লেই নিজেকে অপৌত্তলিক ব'লে গর্ব্ব করে। বৃহদারণ্যক এই বাহ্যিকতাকেও হীন ব'লে নিন্দা করেচেন। তিনি বলেন যে-দেবতাকে আমার থেকে পৃথক ক'রে বাইরে স্থাপন করি তাঁকে স্বীকার করার দ্বারাই নিজেকে নিজের সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিই।

এমনতরো কথায় একটা ক্রুদ্ধ কলরব উঠতে পারে। তবে কি মানুষ নিজেকে নিজেই পূজা করবে। নিজেকে ভক্তি করা কি সম্ভব। তাহলে পূজা ব্যাপারকে তো বলতে হবে অহঙ্কারের বিপুলীকরণ।

একেবারে উল্‌টো। অহংকে নিয়েই অহংকার। সে তো পশুও করে। অহং থেকে বিযুক্ত আত্মায় ভূমার উপলব্ধি একমাত্র মানুষের পক্ষেই সাধ্য।

কেননা মানুষের পক্ষে তাই সত্য। ভূমা আহারে বিহারে আচারে বিচারে ভোগে নৈবেদ্যে মন্ত্রে তন্ত্রে নয়। ভূমা বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্ম্মে। বাইরে দেবতাকে রেখে স্তবে অনুষ্ঠানে পূজোপচারে শাস্ত্রপাঠে বাহ্যিক বিধি নিষেধ পালনে উপাসনা করা সহজ কিন্তু আপনার চিন্তায় আপনার কর্ম্মে পরম মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সবচেয়ে কঠিন সাধনা। সেই জন্যেই কথিত আছে **নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।** তারা সত্যকে অন্তরে পায় না যারা অন্তরে দুর্ব্বল। অহঙ্কারকে দূর করতে হয় তবেই অহংকে পেরিয়ে আত্মাতে পৌঁছতে পারি।

য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু-র্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্য-কামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজি-জ্ঞাসিতব্যঃ।

—আমার মধ্যে যে মহান আত্মা আছেন যিনি জরামৃত্যু-শোক ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত, যিনি সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প তাঁকে অন্বেষণ করতে হবে তাঁকে জানতে হবে "মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।" এই যে তাঁকে সন্ধান করা তাঁকে জানা এ তো বাইরে জানা বাইরে পাওয়া নয়, এ যে আপন অন্তরে আপনি হওয়ার দ্বারা জানা, হওয়ার দ্বারা পাওয়া।

প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ

—যুক্তিতর্কের যোগে বাহ্যজ্ঞানের বিষয়কে যেমন করে জানি এ তো তেমন করে জানা নয়, অন্তরে হওয়ার দ্বারা জানা। নদী সমুদ্রকে পায় যেমন করে, প্রতিক্ষণেই সমুদ্র হতে হতে। এক দিকে সে ছোটনদী, আর-এক দিকে সে বৃহৎ সমুদ্র। সেই হওয়া তার পক্ষে সম্ভব, কেননা সমুদ্রের সঙ্গে তার স্বাভাবিক ঐক্য; বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে সেই ঐক্য। জীবধর্ম্ম যেন উঁচু পাড়ির মতো জন্তুদের চেতনাকে ঘিরে আটক করেচে। মানুষের আত্মা জীবধর্ম্মের পাড়ির ভিতর দিয়ে তাকে কেবলি পেরিয়ে চলেচে—মিলেচে আত্মার মহাসাগরে—সেই সাগরের যোগে সে জেনেচে আপনাকে। যেমন নদী পায় আপনাকে যখন সে বৃহৎ জলরাশিকে আপন করে, নইলে সে থাকে বদ্ধ হয়ে, বিল হয়ে, জলা হয়ে। তাই বাউল মানুষকে বলেচে, "তোরি ভিতর অতল সাগর।" পূর্ব্বেই বলেচি মানুষ আপন ব্যক্তিগত সংস্কারকে পার হয়ে যে-জ্ঞানকে পায়, যাকে বলে বিজ্ঞান, সেই জ্ঞান নিখিল মানবের, তাকে সকল মানুষই স্বীকার করবে, সেই জন্যে তা শ্রদ্ধেয়। তেমনি মানুষের মধ্যে স্বার্থগত আমির চেয়ে যে-বড়ো আমি, সেই আমির সঙ্গে সকলের ঐক্য, তার কর্ম্ম সকলের কর্ম্ম। একলা আমির কর্ম্মই

বন্ধন, সকল আমির কর্ম্ম মুক্তি। আমাদের বাংলা দেশের বাউল বলেচে—

মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ
একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সর্ব্বঠাঁই।

সেই মনের মানুষ সকল মনের মানুষ, আপন মনের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেলে সকলের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া হয়। এই কথাই উপনিষদ বলেচেন,

যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি।

বলেচেন,

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ

—যিনি বেদনীয় সেই পূর্ণ মানুষকে জানো, অন্তরে আপনার বেদনায় যাঁকে জানা যায় তাঁকে সেই বেদনায় জানো, জ্ঞানে নয়, বাইরে নয়।

আমাদের শাস্ত্রে **সোঽহম্** ব'লে যে তত্ত্বকে স্বীকার করা হয়েচে তা যত বড়ো অহঙ্কারের মতো শুনতে হয় আসলে তা নয়। এতে ছোটোকে বড়ো বলা হয়নি, এতে সত্যকে ব্যাপক বলা হয়েচে। আমার যে ব্যক্তিগত আমি তাকে ব্যাপ্ত করে আছে বিশ্বগত আমি। মাথায় জটা ধারণ করলে গায়ে ছাই মাখলে বা মুখে এই শব্দ উচ্চারণ করলেই **সোঽহম্-সত্যকে** প্রকাশ করা হোলো এমন কথা যে মনে করে সেই অহঙ্কৃত। যে-আমি সকলের, সেই আমিই আমারও, এটা সত্য,

কিন্তু এই সত্যকে আপন করাই মানুষের সাধনা। মানুষের ইতিহাসে চিরকাল এই সাধনাই নানা রূপে নানা নামে নানা সঙ্কল্পের মধ্য দিয়ে চলেচে। যিনি পরম আমি, যিনি সকলের আমি সেই আমিকেই আমার ব'লে সকলের মধ্যে জানা যে পরিমাণে আমাদের জীবনে আমাদের সমাজে উপলব্ধ হচ্চে সেই পরিমাণেই আমরা সত্য মানুষ হয়ে উঠচি। মানুষের রিপু মাঝখানে এসে এই সোঽহম্ উপলব্ধিকে দুইভাগ করে দেয়, একান্ত হয়ে ওঠে অহম্।

তাই উপনিষদ বলেন,

মা গৃধঃ

—লোভ কোরো না। লোভ বিশ্বের মানুষকে ভুলিয়ে বৈষয়িক মানুষ করে দেয়। যে-ভোগ মানুষের যোগ্য তা সকলকে নিয়ে, তা বিশ্বভৌমিক, তা মানুষের সাহিত্যে আছে, শিল্পকলায় আছে, তাই প্রকাশ পায় মানুষের সংসারযাত্রায়, তার হৃদয়ের আতিথ্যে। তাই আমাদের শাস্ত্রে বলে

অতিথিদেবো ভব।

কেননা আমার ভোগ সকলের ভোগ এই কথাটা অতিথিকে দিয়ে গৃহস্থ স্বীকার করে, তার ঐশ্বর্য্যের সঙ্কোচ দূর হয়। ব্যক্তিগত মানবের ঘরে সর্ব্বমানবের প্রতিনিধি হয়ে আসে অতিথি, তার গৃহসীমাকে

বিশ্বের দিকে নিয়ে যায়। না নিয়ে গেলে সেটা রাজ-প্রাসাদের পক্ষেও দীনতা। এই আতিথ্যের মধ্যে আছে সোঽহংতত্ত্ব—অর্থাৎ আমি তাঁর সঙ্গে এক যিনি আমার চেয়ে বড়ো। আমি তাঁর সঙ্গে মিলে আছি যিনি আমার এবং আমার অতিরিক্ত।

আমাদের দেশে এমন সকল সন্ন্যাসী আছেন, যাঁরা সোঽহংতত্ত্বকে নিজের জীবনে অনুবাদ করে নেন নিরতিশয় নৈষ্কর্ম্ম্যে ও নির্ম্মমতায়। তাঁরা দেহকে পীড়ন করেন জীবপ্রকৃতিকে লঙ্ঘন করবার জন্যে, মানুষের স্বাধীন দায়িত্বও ত্যাগ করেন মানবপ্রকৃতিকে অস্বীকার করবার স্পর্দ্ধায়। তাঁরা অহংকে বর্জ্জন করেন যে-অহং বিষয়ে আসক্ত, আত্মাকেও অমান্য করেন যে-আত্মা সকল আত্মার সঙ্গে যোগে যুক্ত। তাঁরা যাঁকে ভূমা বলেন তিনি উপনিষদে উক্ত সেই ঈশ নন যিনি সকলকেই নিয়ে আছেন, তাঁদের ভূমা সব-কিছু হতে বর্জ্জিত সুতরাং তাঁর মধ্যে কর্ম্মতত্ত্ব নেই। তাঁরা মানেন না তাঁকে, যিনি

পৌরুষং নৃষু

মানুষের মধ্যে যিনি মনুষ্যত্ব, যিনি বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা, যাঁর কর্ম্ম খণ্ডকর্ম্ম নয়, যাঁর কর্ম্ম বিশ্বকর্ম্ম; যাঁর

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ

যাঁর মধ্যে জ্ঞানশক্তি ও কর্ম্ম স্বাভাবিক, যে-স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তিকর্ম্ম অন্তহীন দেশে কালে প্রকাশমান।

পূর্ব্বেই বলেচি মানুষের অভিব্যক্তির গতি অন্তরের দিকে। এই দিকে তার সীমার আবরণ খুলে যাবার পথ। একদা মানুষ ছিল বর্ব্বর, সে ছিল পশুর মতো, তখন ভৌতিক জীবনের সীমায় তার মন তার কর্ম্ম ছিল বদ্ধ। জ্বলে উঠল যখন ধীশক্তি, তখন চৈতন্যের রশ্মি চলল সঙ্কীর্ণ জীবনের সীমা ছাড়িয়ে, বিশ্বভৌমিকতার দিকে। ভারতীয় মধ্যযুগের কবিস্মৃতিভাণ্ডার সুহৃদ ক্ষিতিমোহনের কাছ থেকে কবি রজ্জবের একটি বাণী পেয়েচি। তিনি বলেচেন,—

> সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ
> না মিলৈ সো ঝূঁঠ।
> জন রজ্জব সাঁচী কহী
> ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ।

সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলল না তা মিথ্যে, রজ্জব বলচে এই কথাই খাঁটি, এতে তুমি খুসিই হও আর রাগই করো।

ভাষা থেকে বোঝা যাচ্চে রজ্জব বুঝেচেন এ কথায় রাগ করবার লোকই সমাজে বিস্তর। তাদের মত ও প্রথার সঙ্গে বিশ্বসত্যের মিল হচ্চে না, তবু তারা

তাকে সত্য নাম দিয়ে জটিলতায় জড়িয়ে থাকে,—মিল নেই বলেই এই নিয়ে তাদের উত্তেজনা উগ্রতা এত বেশি। রাগারাগির দ্বারা সত্যের প্রতিবাদ, অগ্নিশিখাকে ছুরি দিয়ে বেঁধবার চেষ্টার মতো। সেই ছুরি সত্যকে মারতে পারে না, মারে মানুষকে। তবু সেই বিভীষিকার সামনে দাঁড়িয়েই বলতে হবে,

সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ
না মিলৈ সো ঝূঁঠ।

একদা যে-দিন কোনো একজন মাত্র বৈজ্ঞানিক বললেন, পৃথিবী সূর্য্যের চার দিকে ঘুরচে সে-দিন সেই একজন মাত্র মানুষই বিশ্বমানুষের বুদ্ধিকে প্রকাশ করেচেন। সে-দিন লক্ষ লক্ষ লোক সে কথায় ক্রুদ্ধ, তারা ভয় দেখিয়ে জোর করে বলাতে চেয়েচে সূর্য্যই পৃথিবীর চার দিকে ঘুরচে; তাদের সংখ্যা যতই বেশি হোক, তাদের গায়ের জোর যতই থাক, তবু তারা প্রজ্ঞাকে অস্বীকার করবামাত্র চিরকালের মানবকে অস্বীকার করলে। সে-দিন অসংখ্য বিরুদ্ধবাদীর মাঝখানে একলা দাঁড়িয়ে কে বলতে পেরেচে সোঽহম্ অর্থাৎ আমার জ্ঞান আর মানবভূমার জ্ঞান এক, তিনিই বলেচেন যাঁকে সে-দিন বিপুল জনসংঘ সত্য প্রত্যাখ্যান করাবার জন্যে প্রাণান্তিক পীড়ন করেছিল।

যদি লক্ষ লক্ষ লোক বলে, কোটি যোজন দূরে কোনো বিশেষ গ্রহ-নক্ষত্রের সমবায়ে পৃথিবীর কোনো একটি প্রদেশের জলধারায় এমন অভৌতিক যাদুশক্তির সঞ্চার হয় যাতে স্নানকারীর নিজের ও পূর্ব্বপুরুষের আন্তরিক পাপ যায় ধুয়ে তাহলে বলতেই হবে,

সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ
না মিলৈ সো ঝূঁঠ।

বিশ্বের বুদ্ধি এ বুদ্ধির সঙ্গে মিলল না। কিন্তু যেখানে বলা হয়েছে,

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি

—জল দিয়ে কেবল দেহেরই শোধন হয়, মনের শোধন হয় সত্যে সেখানে বিশ্বমানবমনের সম্মতি পাওয়া যায়। কিংবা যেখানে বলা হয়েছে—

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ
পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাম্ পুনরিতি নিবৃত্ত্যা
পূয়তে তু সঃ॥

—পাপ করে সন্তপ্ত হোলে সেই সন্তাপ থেকেই পাপের মোচন হয়, এমন কাজ আর করব না বলে নিবৃত্ত হোলেই মানুষ পবিত্র হতে পারে, সেখানে এই বলাতেই মানুষ আপন বুদ্ধিতে স্বীকার করে বিশ্বমনের প্রজ্ঞাকে,

তং হ দেবম্ আত্মবুদ্ধিপ্রকাশম্

—সেই দেবতাকে আমাদের আত্মায় জানি যিনি আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক। আমার মন আর বিশ্বমন একই এই কথাই সত্য-সাধনার মূলে, আর ভাষান্তরে এই কথাই **সোঽহম্**।

একদিন ব্রাহ্মণ রামানন্দ তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে চলে গিয়ে আলিঙ্গন করলেন নাভা চণ্ডালকে, মুসলমান জোলা কবীরকে, রবিদাস চামারকে। সেদিনকার সমাজ তাঁকে জাতিচ্যুত করলে। কিন্তু তিনি একলাই সেদিন সকলের চেয়ে বড়ো জাতিতে উঠেছিলেন যে-জাতি নিখিল মানুষের। সেদিন ব্রাহ্মণমণ্ডলীর ধিক্কারের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে রামানন্দই বলেছিলেন **সোঽহম্**; সেই সত্যের শক্তিতেই তিনি পার হয়ে গিয়েছিলেন সেই ক্ষুদ্র সংস্কারগত ঘৃণাকে, যা নিষ্ঠুর হয়ে মানুষে মানুষে ভেদ ঘটিয়ে সমাজস্থিতির নামে সমাজধর্ম্মের মূলে আঘাত করে।

একদিন যিশুখৃষ্ট বলেছিলেন "**সোঽহম্**" আমি আর আমার পরমপিতা একই। কেননা তাঁর যে-প্রীতি যে-কল্যাণবুদ্ধি সকল মানুষের প্রতি সমান প্রসারিত সেই প্রীতির আলোকেই আপন অহংসীমাকে ছাড়িয়ে পরম মানবের সঙ্গে তিনি আপন অভেদ দেখেছিলেন।

বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন, সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ মৈত্রী

পোষণ করবে। দাঁড়াতে বসতে চলতে শুতে যাবৎ নিদ্রিত না হবে এই মৈত্রীস্মৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকবে, এ'কেই বলে ব্রহ্মবিহার।

এত বড়ো উপদেশ মানুষকেই দেওয়া চলে। কেননা মানুষের মধ্যে গভীর হয়ে আছে সোঽহংতত্ত্ব সে কথা বুদ্ধদেব নিজের মধ্য থেকেই জেনেচেন, তাই বলেচেন অপরিমাণ প্রেমেই আপনার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে মানুষ প্রকাশ করে।

অথর্ব্ববেদ বলেন,

তস্মাদ্ বৈ বিদ্বান্ পুরুষমিদং ব্রহ্মেতি মন্যতে

—যিনি বিদ্বান তিনি মানুষকে তার প্রত্যক্ষের অতীত বৃহৎ ব'লেই জানেন। সেই জন্যে তিনি তার কাছে প্রত্যাশা করতে পারেন দুঃসাধ্য কর্ম্মকে অপরিমিত ত্যাগকে।

যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্

—যাঁরা ভূমাকে জানেন মানুষে, তাঁরা জানেন পরম দেবতাকেই। সেই মানবদেবতাকে মানুষের মধ্যে জেনেছিলেন ব'লেই বুদ্ধদেব উপদেশ দিতে পেরেছিলেন—

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং
আয়ুসা এক পুত্তমনুরক্‌খে,

এবম্পি সব্বভূতেসু
মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।

মা যেমন আপন আয়ু-ক্ষয় করেই নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি মনে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাবে।

মাথা গণে' বলব না ক'জন এই উপদেশ পালন করতে পারে। সেই গণনায় নয় সত্যের বিচার।

মানুষের অসীমতা যিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলেন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়নি মাথা গোণবার। তিনি অসঙ্কোচে মানুষের মহামানবকে আহ্বান করেছিলেন, বলেছিলেন অপরিমাণ ভালোবাসায় প্রকাশ করো আপনার অন্তরে ব্রহ্মকে। এই বাণী অসঙ্কোচে সকলকে শুনিয়ে তিনি মানুষকে শ্রদ্ধা করেছিলেন।

আমাদের দেশে এমন আত্মাবমাননার কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে সোঽহংতত্ত্ব সকলের নয়, কেবল তাঁদেরই যাঁরা ক্ষণজন্মা। এই ব'লে মানুষের অধিকারকে শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্টভেদে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে নিশ্চেষ্ট নিকৃষ্টতাকে আরাম দেওয়া হয়েচে। আমাদের দেশে যাদের অন্ত্যজ বলা হয় তারা যেমন নিজের হেয়তাকে নিশ্চল করে রাখতে কুণ্ঠিত হয় না, তেমনি এ দেশে অগণ্য মানুষ আপন কনিষ্ঠ অধিকার নিঃসঙ্কোচে

মেনে নিয়ে মূঢ়তাকে, চিত্তের ও ব্যবহারের দীনতাকে, বিচিত্র আকারে প্রকাশ করতে বাধা পায় না। কিন্তু মানুষ হয়ে জন্মেচি, ললাটের লিখনে নিয়ে এসেচি সোঽহম্, এই বাণীকে সার্থক করবার জন্যেই আমরা মানুষ। আমাদের একজনেরও অগৌরব সকল মানুষের গৌরব ক্ষুণ্ণ করবে। যে সেই আপন অধিকারকে খর্ব্ব করে সে নিজের মধ্যে তাঁর অসম্মান করে যিনি

কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী

—যিনি সকলের কর্ম্মের অধ্যক্ষ, সকলের যিনি অন্তরতম সাক্ষী, সকলের মধ্যে যাঁর বাস।

পূর্ব্বেই দেখিয়েচি অথর্ব্ববেদ বলেচেন মানুষ প্রত্যক্ষত যা পরমার্থত তার চেয়ে বেশি, সে আছে অসীম উদ্বৃত্তের মধ্যে। সেই উদ্বৃত্তেই মানুষের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, তার **ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্ম্মশ্চ কর্ম্ম চ।**

স্থূল দ্রব্যময়ী এই পৃথিবী। তাকে বহুদূর অতিক্রম করে গেছে তার বায়ুমণ্ডল। সেই অদৃশ্য বায়ুলোকের ভিতর দিয়ে আসচে তার আলো, তার বর্ণচ্ছটা, বইচে তার প্রাণ, এরই উপর জমচে তার মেঘ, ঝরচে তার বারিধারা, এইখানকার প্রেরণাতেই তার অঙ্গে অঙ্গে রূপধারণ করচে পরম রহস্যময় সৌন্দর্য্য, এইখান থেকেই আসচে পৃথিবীর যা শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীর শ্রী, পৃথিবীর প্রাণ। এই

বায়ুমণ্ডলেই পৃথিবীর সেই জানলা খোলা রয়েচে যেখানে নক্ষত্রলোক থেকে অন্ধকার পেরিয়ে প্রতিরাত্রে দূত আসচে আত্মীয়তার জ্যোতির্ম্ময় বার্ত্তা নিয়ে। এই তার প্রসারিত বায়ুমণ্ডলকেই বলা যেতে পারে পৃথিবীর উদ্বৃত্ত ভাগের আত্মা, যেমন পূর্ণ মানুষকে বলা হয়েচে, **ত্রিপাদস্যামৃতম্** তাঁর এক অংশ প্রত্যক্ষ বাকি তিন অংশ অমৃতরূপে তাঁকে ছাড়িয়ে আছে ঊর্দ্ধে। এই সূক্ষ্মবায়ুলোক ভূলোকের একান্ত আপনারই ব'লে সম্ভব হয়েচে পৃথিবীর ধূলিস্তরে এত বিচিত্র ঐশ্বর্য্য বিস্তার যার মূল্য ধূলির মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি।)

উপনিষদ বলেন অসম্ভূতি ও সম্ভূতিকে এক ক'রে জানলেই তবে সত্য জানা হয়। অসম্ভূতি, যা অসীমে অব্যক্ত, সম্ভূতি যা দেশে কালে অভিব্যক্ত। এই সীমায় অসীমে মিলে মানুষের সত্য সম্পূর্ণ। মানুষের মধ্যে যিনি অসীম তাঁকে সীমার মধ্যে জীবনে সমাজে ব্যক্ত করে তুলতে হবে। অসীম সত্যকে বাস্তব সত্য করতে হবে। তা করতে গেলে কর্ম্ম চাই। ঈশোপনিষদ তাই বলেন শত বৎসর তোমাকে বাঁচতে হবে কর্ম্ম তোমার না করলে নয়। শত বৎসর বাঁচাকে সার্থক করো কর্ম্মে, এমনতরো কর্ম্মে যাতে প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রমাণের সঙ্গে বলতে পারা যায় **সোঽহম্**। এ নয় যে, চোখ উলটিয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকতে হবে মানুষের থেকে দূরে।

অসীম উদ্বৃত্ত থেকে মানুষের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠতা সঞ্চারিত হচ্চে সে কেবল সত্যং ঋতং নয়, তার সঙ্গে আছে রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্ম্মশ্চ কর্ম্ম চ ভূতং ভবিষ্যৎ। এই যে-কর্ম্ম এই যে-শ্রম যা জীবিকার জন্যে নয় এর নিরন্তর উদ্যম কোন্ সত্যে? কিসের জোরে মানুষ প্রাণকে করচে তুচ্ছ, দুঃখকে করচে বরণ, অন্যায়ের দুর্দ্দান্ত প্রতাপকে উপেক্ষা করচে বিনা উপকরণে, বুক পেতে নিচ্চে অবিচারের দুঃসহ মৃত্যুশেল। তার কারণ, মানুষের মধ্যে শুধু কেবল তার প্রাণ নেই, আছে তার মহিমা। সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষেরই মাথা তুলে বলবার অধিকার আছে সোঽহম্। সেই অধিকার জাতিবর্ণনির্ব্বিচারে সকল মানুষেরই। ক্ষিতিমোহনের অমূল্য সংগ্রহ থেকে বাউলের এই বাণী পাই—

জীবে জীবে চাইয়া দেখি সবই যে তার অবতার,
ও তুই নূতন লীলা কী দেখাবি যার নিত্য লীলা চমৎকার।

প্রতিদিনই মানবসমাজে এই লীলা। অসংখ্য মানুষ জ্ঞানে প্রেমে ত্যাগে নানা আকারেই অপরিমেয়কে প্রকাশ করচে। ইতিহাসে তাদের নাম ওঠে না, আপন প্রাণ থেকে মানুষের প্রাণপ্রবাহে তারা ঢেলে দিয়ে যায় তাঁরই অমিততেজ

যশ্চায়মস্মিন্ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ

—যিনি এই আত্মার মধ্যেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সমস্তই অনুভব করেন, যেমন আকাশব্যাপী তেজকে উদ্ভিদ আপন প্রাণের সামগ্রী করে নিয়ে পৃথিবীর প্রাণলোকে উৎসর্গ করে।

(উদ্ভিদের ভিতর দিয়ে বিশ্বতেজ যদি প্রাণবস্তুতে নিয়ত পরিণত না হোতে পারত তাহলে জীবলোক যেমন মরুশয্যাশায়ী হোত তেমনি আমাদের গোচরে অগোচরে দেশে দেশে কালে কালে নরনারী নিজের অন্তরস্থিত পরম পুরুষের অমিততেজ যদি কল্যাণে ও প্রেমে জ্ঞানে ও কর্ম্মে নিরন্তর সমাজের প্রাণবস্তুতে পরিণত না করত তাহলে সমাজ সোঽহংতত্ত্ববর্জ্জিত হয়ে পশুলোকের সাথে এক হয়ে যেত। তাও নয়, আপন সত্য হোতে স্খলিত হয়ে বাঁচতেই পারত না।) ডাক্তার বলেন, মানুষের দেহে পশুরক্ত সঞ্চার করলে তাতে তার প্রাণ-বৃদ্ধি না হয়ে প্রাণনাশ হয়। পশুসমাজ পশুভাবেই চিরদিন বাঁচতে পারে মানুষের সমাজ পশু হয়ে বাঁচতেই পারে না। তার্কিক বলবে নরলোকে তো অনেক পশু আরামেই বেড়ে ওঠে। শরীরে ফোড়াও তো বাড়ে। আশপাশের চেয়ে তার উন্নতি বেশি বই কম নয়। সমস্ত দেহে স্বাস্থ্যের গৌরব সেই ফোড়াকে যদি ছাড়িয়ে না যায় তাহলে সে মারে এবং মেরে মরে। প্রকৃতিস্থ সমাজ অনেক পাপ সইতে পারে কিন্তু যখন তার বিকৃতিটাই

হয়ে ওঠে প্রধান, তখন চিন্তায় ব্যবহারে সাহিত্যে শিল্প-কলায় পশুরক্তস্রোত আত্মস্থ করে সমাজ বেশি দিন বাঁচতেই পারে না। বিলাসোন্মত্ত রোম কি আপন ঐশ্বর্য্যের মধ্যেই পাকা ফলে কীটের মতো মরেনি? কালিদাস রঘুবংশের যে পতনের ছবি দিয়েচেন সে কি মানুষের জীবনে পশু প্রবেশের ফলেই না?

অথর্ববেদে শুধু কেবল সত্য ও ঋতের কথা নেই আছে রাষ্ট্রের কথাও। জনসংঘের শ্রেষ্ঠরূপ প্রকাশ করবার জন্যে তার রাষ্ট্র। ছোটো টবের বাইরে বনস্পতি যদি তার হাজার শিকড় মেলতে না পারে তাহলে সে বেঁটে হয়ে কাঠি হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের প্রশস্ত ভূমি না পেলে জনসমূহ পৌরুষবর্জ্জিত হয়ে থাকে। আপনার মধ্যে যে-ভূমাকে প্রমাণ করবার দায়িত্ব মানুষের, সমস্ত জাতি বৃহৎ জীবনযাত্রায় তার থেকে বঞ্চিত হোলে ইতিহাসে ধিক্কৃত হয়। সকলের মাঝখানে সকল কালের সম্মুখে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলতে পারে না সোঽহম্, বলতে পারে না আমি আছি আমার মহিমায়, যে-আমি কেবল আজকের দিনের জন্যে নয়, যার আত্মঘোষণা ভাবী কালের তোরণে তোরণে ধ্বনিত হোতে থাকবে। ইতিহাসের সেই ধিক্কার বহুকালের সুপ্তিমগ্ন এসিয়া মহাদেশের বক্ষে দিয়েচে আজ আঘাত; সকল দিকেই শুনচি জনগণের অন্তর্যামী মহান পুরুষ তামসিকতার বন্দীশালায় শৃঙ্খলে

দিয়েছেন ঝঙ্কার, তাঁর প্রকাশের তপোদীপ্তি জ্বলে উঠেচে **তমসঃ পরস্তাৎ।** রব উঠেচে, **শৃণ্বন্তু বিশ্বে** শোনো বিশ্বজন তাঁর আহ্বান শোনো, যে-আহ্বানে ভয় যায় ছুটে, স্বার্থ হয় লজ্জিত, মৃত্যুঞ্জয় শৃঙ্গধ্বনি ক'রে ওঠেন মৃত্যুদুঃখবন্ধুর অমৃতের পথে।

ভূমা থেকে উৎশিষ্ট যে-শ্রেষ্ঠতার কথা অথর্ব্ববেদ বলেচেন সে কোনো একটিমাত্র বিশেষ সিদ্ধিতে নয়। মানুষের সকল তপস্যাই তার মধ্যে, মানুষের **বীর্য্যং লক্ষ্মীর্বলং** সমস্ত তার অন্তর্গত। মনুষ্যত্বের বহুধা বৈচিত্র্যকে একটিমাত্র বিন্দুতে সংহত ক'রে নিশ্চল করলে হয় তো তার আত্মভোলা একটা আনন্দ আছে। কিন্তু **ততঃ কিম্,** কী হবে সে আনন্দে। সে আনন্দকে বলব না শ্রেয়, বলব না চরম সত্য। সমস্ত মানব-সংসারে যতক্ষণ দুঃখ আছে অভাব আছে অপমান আছে ততক্ষণ কোনো একটিমাত্র মানুষ নিষ্কৃতি পেতে পারে না। একটিমাত্র প্রদীপ অন্ধকারে একটুমাত্র ছিদ্র করলে তাতে রাত্রির ক্ষয় হয় না, সমস্ত অন্ধকারের অপসারণে রাত্রির অবসান। সেই জন্যে মানুষের মুক্তি যে-মহাপুরুষেরা কামনা করেচেন তাঁদেরই বাণী

সম্ভবামি যুগে যুগে।

যুগে যুগেই তো জন্মাচ্চেন তাঁরা দেশে দেশে। আজও এই মুহূর্ত্তেই জন্মেচেন কালও জন্মাবেন। সেই জন্মের

ধারা চলেচে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে, এই বাণী বহন ক'রে, সোঽহম্, I and my Father are one.

সোঽহম্ মন্ত্র মুখে আউড়িয়ে তুমি দুরাশা করো কর্ম্ম থেকে ছুটি নিতে। সমস্ত পৃথিবী রইল পড়ে, তুমি একা যাবে দায় এড়িয়ে। যে ভীরু চোখ বুজে মনে করে পালিয়েচি সে কি সত্যই পালিয়েচে। সোঽহম্ সমস্ত মানুষের সম্মিলিত অভিব্যক্তির মন্ত্র, কেবল এক জনের না। ব্যক্তিগত শক্তিতে নিজে কেউ যতটুকু মুক্ত হচ্চে সেই মুক্তি তার নিরর্থক যতক্ষণ সে তা সকলকে না দিতে পারে। বুদ্ধদেব আপনার মুক্তিতেই সত্যই যদি মুক্ত হতেন তাহলে একজন মানুষের জন্যেও তিনি কিছুই করতেন না। দীর্ঘজীবন ধরে তাঁর তো কর্ম্মের অন্ত ছিল না। দৈহিক প্রাণ নিয়ে তিনি যদি আজ পর্য্যন্ত বেঁচে থাকতেন তাহলে আজ পর্য্যন্তই তাঁকে কাজ করতে হোত আমাদের সকলের চেয়ে বেশি। কেননা যাঁরা মহাত্মা তাঁরা বিশ্বকর্ম্মা।

নীহারিকার মহাক্ষেত্রে যেখানে জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি হচ্চে সেখানে মাঝে মাঝে এক একটি তারা দেখা যায়; তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় সমস্ত নীহারিকার বিরাট অন্তরে সৃষ্টি-হোমহুতাশনের উদ্দীপনা। তেমনি মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে মহাপুরুষদের দেখি। তাঁদের থেকে এই কথাই বুঝি যে সমস্ত মানুষের

অন্তরেই কাজ করচে অভিব্যক্তির প্রেরণা। সে ভূমার অভিব্যক্তি। জীবমানব কেবলি তার অহং আবরণ মোচন করে আপনাকে উপলব্ধি করতে চাচ্চে বিশ্ব-মানবে। বস্তুত সমস্ত পৃথিবীরই অভিব্যক্তি আপন সত্যকে খুঁজচে সেইখানে, এই বিশ্বপৃথিবীর চরম সত্য সেই মহামানবে। পৃথিবীর আরম্ভ কালের লক্ষ লক্ষ যুগের পরে মানুষের সূচনা। সেই সাংখ্যিক তথ্য মনে নিয়ে কালের ও আয়তনের পরিমাণে মানুষের ক্ষুদ্রতা বিচার করে কোনো কোনো পণ্ডিত অভিভূত হয়ে পড়েন। পরিমাণকে অপরিমেয় সত্যের চেয়ে বড়ো করা একটা মোহ মাত্র। যাকে আমরা জড় বলি সেই অব্যক্ত প্রাণ বহু কোটি কোটি বৎসর সুপ্ত ছিল। কিন্তু একটিমাত্র প্রাণকণা যে-দিন এই পৃথিবীতে দেখা দিল সেই দিনই জগতের অভিব্যক্তি তার একটি মহৎ অর্থে এসে পৌঁছিল। জড়ের বাহ্যিক সত্তার মধ্যে দেখা দিল একটি আন্তরিক সত্য। প্রাণ আন্তরিক। যেহেতু সেই প্রাণকণা জড়পুঞ্জের তুলনায় দৃশ্যত অতি ক্ষুদ্র এবং যেহেতু সুদীর্ঘকালের একপ্রান্তে তার সদ্য জন্ম তাই তাকে হেয় করবে কে? মূকতার মধ্যে এই যে অর্থ অবারিত হোলো তার থেকে মানুষ বিরাট প্রাণের রূপ দেখলে বললে,

যদিদং কিঞ্চ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।

যা-কিছু সমস্তই প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণে কম্পিত হচ্চে। আমরা জড়কে তথ্যরূপে জানি কেননা সে যে বাইরের। কিন্তু প্রাণকে আমাদের অন্তর থেকে জানি সত্যরূপে। প্রাণের ক্রিয়া অন্তরে অন্তরে—তার সমস্তটাই গতি। তাই চলার একটি মাত্র ভাষা আমাদের কাছে অব্যবহিত, সে আমাদের প্রাণের ভাষা। চলা ব্যাপারকে অন্তর থেকে সত্য করে চিনেচি নিজেরই মধ্যে। বিশ্বে অবিশ্রাম চলার যে উদ্যম তাকে উত্তাপই বলি বিদ্যুৎই বলি সে কেবল একটা কথা মাত্র। যদি বলি এই চলার মধ্যে আছে প্রাণ তাহলে এমন কিছু বলা হয় আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে যার অর্থ আছে। সেই সঙ্গে এও বুঝি আমার প্রাণ যে চলচে সেও ঐ বিশ্বপ্রাণের চলার মধ্যেই। প্রাণগতির এই উদ্যম নিখিলে কোথাও নেই কেবল আকস্মিকভাবে আছে প্রাণীতে, এমন খাপছাড়া কথা আমাদের মন মানতে চায় না যে-মন সমগ্রতার ভূমিকায় সত্যকে শ্রদ্ধা জানায়।

উপনিষদ বলেচেন,

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

একটা কীটও প্রাণের ইচ্ছা করত কিসের জোরে যদি প্রাণের আনন্দ সমস্ত আকাশে না থাকত।

দেশালাইয়ের মুখে একটি শিখা এক মুহূর্ত্তের জন্যেও জ্বলে কী করে যদি সমস্ত আকাশে তার সত্য ব্যাপ্ত না থাকে। প্রাণের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির একটি অন্তরতর অর্থ পাওয়া গেল—সেই অর্থকে বলি ইচ্ছা। জড় মূক হয়ে ছিল, এই ইচ্ছার ভাষা জানাতে পারেনি,—প্রাণ এসে ইচ্ছার বার্ত্তা প্রকাশ করলে। যে-বার্ত্তা গভীরে নিহিত ছিল তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

ছাত্র বহু দিন বহু প্রয়াসে অক্ষর শিখল, বানান শিখল, ব্যাকরণ শিখল, অনেক কাগজে অনেক আঁকা বাঁকা অসম্পূর্ণ নিরর্থক লেখা শিখল, উপকরণ ব্যবহার করল ও বর্জ্জন করল বিস্তর; অবশেষে কবিরূপে যে-মুহূর্ত্তে সে তার প্রথম কবিতাটি লিখতে পেরেচে সেই মুহূর্ত্তে ঐ একটি লেখায় এতদিনকার পুঞ্জ পুঞ্জ বাক্যহীন উপকরণের প্রথম অর্থটুকু দেখা দিল। জগতের বিপুল অভিব্যক্তিতে প্রথম অর্থ দেখলুম প্রাণকণায় তার পরে জন্তুতে, তারপরে মানুষে। বাহির থেকে অন্তরের দিকে একে একে মুক্তির দ্বার খুলে যেতে লাগল। মানুষে এসে যখন ঠেকল তখন যবনিকা উঠতেই জীবকে দেখলুম তার ভূমায়। দেখলুম রহস্যময় যোগের তত্ত্বকে পরম ঐক্যকে। মানুষ বলতে পারলে যাঁরা সত্যকে জানেন তাঁরা

সর্ব্বমেবাবিশন্তি

সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

আলোকেরই মতো মানুষের চৈতন্য মহাবিকিরণের দিকে চলেচে, জ্ঞানে কর্ম্মে ভাবে। সেই প্রসারণের দিকে দেখি তার মহৎকে, দেখি মহামানবকে, দেখি

যশ্চায়মস্মিন্ আত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ,

এবং শুভকামনায় হৃদয়কে সর্ব্বত্র এই ব'লে ব্যাপ্ত করতে পারি :—

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু। সব্বে সত্তা দুক্‌খা পমুঞ্চন্তু। সব্বে সত্তা মা যথালব্ধসম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।

সকল জীব সুখিত হোক, নিঃশত্রু হোক, অবধ্য হোক, সুখী হয়ে কাল হরণ করুক। সকল জীব দুঃখ হতে প্রমুক্ত হোক, সকল জীব যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক।

সেই সঙ্গে এও বলতে পারি দুঃখ আসে তো আসুক, মৃত্যু হয় তো হোক, ক্ষতি ঘটে তো ঘটুক মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হোক, সমস্ত দেশকালকে ধ্বনিত করে বলতে পারুক

সোঽহম্।

পরিশিষ্ট

মানব সত্য

১

আমাদের জন্মভূমি তিনটি, তিনটিই একত্র জড়িত। প্রথম—পৃথিবী। মানুষের বাসস্থান পৃথিবীর সর্ব্বত্র। শীত-প্রধান তুষারাদ্রি, উত্তপ্ত বালুকাময় মরু, উত্তুঙ্গ দুর্গম গিরিশ্রেণী আর এই বাংলার মতো সমতল ভূমি, সর্ব্বত্রই মানুষের স্থিতি। মানুষের বস্তুত বাসস্থান এক। ভিন্ন ভিন্ন জাতির নয়, সমগ্র মানুষ জাতির। মানুষের কাছে পৃথিবীর কোনো অংশ দুর্গম নয়। পৃথিবী তার কাছে হৃদয় অবারিত ক'রে দিয়েচে।

মানুষের দ্বিতীয় বাসস্থান স্মৃতিলোক। অতীত কাল থেকে পূর্ব্বপুরুষদের কাহিনী নিয়ে কালের নীড় সে তৈরি করেচে। এই কালের নীড় স্মৃতির দ্বারা রচিত গ্রথিত। এ শুধু এক-একটা বিশেষ জাতির কথা নয়, সমস্ত মানুষ জাতির কথা। স্মৃতিলোকে সকল মানুষের মিলন। বিশ্বমানবের বাসস্থান—একদিকে পৃথিবী আর

একদিকে সমস্ত মানুষের স্মৃতিলোক। মানুষ জন্মগ্রহণ করে সমস্ত পৃথিবীতে, জন্মগ্রহণ করে নিখিল ইতিহাসে।

তার তৃতীয় বাসস্থান আত্মিকলোক। সেটাকে বলা যেতে পারে সর্ব্বমানবচিত্তের মহাদেশ। অন্তরে অন্তরে সকল মানুষের যোগের ক্ষেত্র এই চিত্তলোক। কারো চিত্ত হয়ত-বা সঙ্কীর্ণ বেড়া দিয়ে ঘেরা, কারো-বা বিকৃতির দ্বারা বিপরীত। কিন্তু একটি ব্যাপক চিত্ত আছে যা ব্যক্তিগত নয় বিশ্বগত। সেটির পরিচয় অকস্মাৎ পাই। একদিন আহ্বান আসে। অকস্মাৎ মানুষ সত্যের জন্যে প্রাণ দিতে উৎসুক হয়। সাধারণ লোকের মধ্যেও দেখা যায়, যখন সে স্বার্থ ভোলে, যেখানে সে ভালবাসে, নিজের ক্ষতি ক'রে ফেলে। তখন বুঝি—মনের মধ্যে একটা দিক আছে যেটা সর্ব্ব-মানবের চিত্তের দিকে।

বিশেষ প্রয়োজনে ঘরের সীমায় খণ্ডাকাশ বদ্ধ কিন্তু মহাকাশের সঙ্গে তার সত্যকার যোগ। ব্যক্তিগত মন আপন বিশেষ প্রয়োজনের সীমায় সঙ্কীর্ণ হলেও তার সত্যকার বিস্তার সর্ব্বমানবচিত্তে। সেইখানকার প্রকাশ আশ্চর্য্যজনক। একজন কেউ জলে পড়ে গেছে আর একজন জলে ঝাঁপ দিলে তাকে বাঁচাবার জন্যে। অন্যের প্রাণরক্ষার জন্যে নিজের প্রাণ সঙ্কটাপন্ন করা। নিজের সত্তাই যার একান্ত সে বলবে আপনি বাঁচলে বাপের

নাম। কিন্তু আপনি বাঁচাকে সব চেয়ে বড় বাঁচা বললে না, এমনও দেখা গেল। তার কারণ সর্ব্বমানবসত্তা পরস্পর যোগযুক্ত।

আমার জন্ম যে-পরিবারে সে-পরিবারের ধর্ম্মসাধন একটি বিশেষভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জাতকর্ম্ম থেকে আরম্ভ ক'রে আমার সব সংস্কারই বৈদিক মন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে। আমি ইস্কুল-পালানো ছেলে। যেখানেই গণ্ডী দেওয়া হয়েচে সেখানেই আমি বনিবনাও করতে পারিনি কখনও। যে-অভ্যাস বাইরে থেকে চাপানো তা আমি গ্রহণ করতে অক্ষম। কিন্তু পিতৃদেব সে জন্যে কখনও ভর্ৎসনা করতেন না। তিনি নিজেই স্বাধীনতা অবলম্বন ক'রে পৈতামহিক সংস্কার ত্যাগ করেছিলেন। গভীরতর জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার স্বাধীনতা আমারও ছিল। এ কথা স্বীকার করতেই হবে আমার এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যে কখনও কখনও তিনি বেদনা পেয়েচেন। কিছু বলেননি।

বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বার-বার আবৃত্তি দ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সব-কিছু গ্রহণ করতে পারিনি সকল মন দিয়ে। শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিল না

হয়ত। এমন সময় উপনয়ন হ'ল। উপনয়নের সময় গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র মুখস্থভাবে না। বারংবার সুস্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে আবৃত্তি করেচি এবং পিতার কাছে গায়ত্রী মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েচি। তখন আমার বয়স বারো বৎসর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হ'ত বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক অন্তরীক্ষ, আমি তারি সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করচেন। চৈতন্য ও বিশ্ব; বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলচে।

এমনি ক'রে ধ্যানের দ্বারা যাকে উপলব্ধি করচি, তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এই রকম চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিলে। এ আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।

যখন বয়স হয়েচে, হয়ত আঠারো কি উনিশ হবে বা বিশও হ'তে পারে, তখন চৌরঙ্গীতে ছিলুম দাদার সঙ্গে। এমন দাদা কেউ কখনও পায়নি। তিনি ছিলেন একাধারে বন্ধু ভাই সহযোগী।

তখন প্রত্যূষে ওঠা প্রথা ছিল। আমার পিতাও খুব প্রত্যূষে উঠতেন। মনে আছে একবার ডালহৌসি

পাহাড়ে পিতার সঙ্গে ছিলুম। সেখানে প্রচণ্ড শীত। সেই শীতে ভোরে আলো-হাতে এসে আমাকে শয্যা থেকে উঠিয়ে দিতেন। সেই ভোরে উঠে একদিন চৌরঙ্গীর বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। তখন ওখানে ফ্রি ইস্কুল ব'লে একটা ইস্কুল ছিল। রাস্তাটা পেরিয়েই ইস্কুলের হাতাটা দেখা যেত। সেদিকে চেয়ে দেখলুম গাছের আড়ালে সূর্য্য উঠচে। যেমনি সূর্য্যের আবির্ভাব হ'ল গাছের অন্তরালের থেকে, অমনি মনের পর্দ্দা খুলে গেল। মনে হ'ল মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে। সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হ'লে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু সেদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খ'সে পড়ল। মনে হ'ল সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম। দু-জন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলেচে। তাদের দেখে মনে হ'ল কী অনির্ব্বচনীয় সুন্দর। মনে হ'ল না তারা মুটে। সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম, যেখানে আছে চিরকালের মানুষ।

সুন্দর কাকে বলি? বাইরে যা অকিঞ্চিৎকর, যখন দেখি তার আন্তরিক অর্থ তখন দেখি সুন্দরকে। একটি গোলাপ ফুল বাছুরের কাছে সুন্দর নয়। মানুষের কাছে সে সুন্দর যে-মানুষ তার কেবল পাপড়ি না বোঁটা না,

একটা সমগ্র আন্তরিক সার্থকতা পেয়েচে। পাবনার গ্রামবাসী কবি যখন প্রতিকূল প্রণয়িনীর মানভঞ্জনের জন্যে 'ট্যাহা দামের মোটরি' আনার প্রস্তাব করেন তখন মোটরির দাম এক টাকার চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। এই মোটরি বা গোলাপের আন্তরিক অর্থটি যখন দেখতে পাই তখনই সে সুন্দর। সেদিন তাই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম। দেখলুম সমস্ত সৃষ্টি অপরূপ। আমার এক বন্ধু ছিল সে সুবুদ্ধির জন্যে বিশেষ বিখ্যাত ছিল না। তার সুবুদ্ধির একটু পরিচয় দিই। একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা, ঈশ্বরকে দেখেচ?' আমি বললুম, 'না, দেখিনি তো।' সে বললে, 'আমি দেখেচি।' জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী রকম?' সে উত্তর করলে, 'কেন? এই যে চোখের কাছে বিজ্‌-বিজ্‌ করচে।' সে এলে ভাবতুম, বিরক্ত করতে এসেচে। সেদিন তাকেও ভালো লাগল। তাকে নিজেই ডাকলুম। সে দিন মনে হ'ল তার নির্ব্বুদ্ধিতাটা আকস্মিক, সেটা তার চরম ও চিরন্তন সত্য নয়। তাকে ডেকে সেদিন আনন্দ পেলুম। সেদিন সে 'অমুক' নয়। আমি যার অন্তর্গত সেও সেই মানবলোকের অন্তর্গত। তখন মনে হ'ল এই মুক্তি। এই অবস্থায় চার দিন ছিলুম। চার দিন জগৎকে সত্যভাবে দেখেচি। তারপর জ্যোতিদা বললেন, 'দার্জিলিঙ চলো।' সেখানে গিয়ে

আবার পর্দ্দা পড়ে গেল। আবার সেই অকিঞ্চিৎকরতা, সেই প্রাত্যহিকতা। কিন্তু তার পূর্ব্বে কয়দিন সকলের মাঝে যাঁকে দেখা গেল তাঁর সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত আর সংশয় রইল না। তিনি সেই অখণ্ড মানুষ যিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, যিনি অরূপ, কিন্তু সকল মানুষের রূপের মধ্যে যাঁর অন্তরতম আবির্ভাব।

২

সেই সময়ে এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে। ঠিক সেই সময়ে বা তার অব্যবহিত পরে যে-ভাবে আমাকে আবিষ্ট করেছিল, তার স্পষ্ট ছবি দেখা যায় আমার সেই সময়কার কবিতাতে—"প্রভাতসঙ্গীতে"র মধ্যে। তখন স্বতঃই যে-ভাব আপনাকে প্রকাশ করেচে, তাই ধরা পড়েচে প্রভাতসঙ্গীতে। পরবর্ত্তী কালে চিন্তা ক'রে লিখলে তার উপর ততটা নির্ভর করা যেত না। গোড়াতেই ব'লে রাখা ভালো, "প্রভাতসঙ্গীত" থেকে যে কবিতা শোনাবো তা কেবল তখনকার ছবিকে স্পষ্ট দেখাবার জন্যে, কাব্যহিসাবে তার মূল্য অত্যন্ত সামান্য। আমার কাছে এর একমাত্র মূল্য এই যে, তখনকার কালে আমার মনে যে-একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস এসেছিল

তা এতে ব্যক্ত হয়েচে। তার ভাব অসংলগ্ন, ভাষা কাঁচা, যেন হাৎড়ে হাৎড়ে বলবার চেষ্টা। কিন্তু 'চেষ্টা' বললেও ঠিক হবে না, বস্তুত চেষ্টা নেই তাতে, অস্ফুটবাক মন বিনা চেষ্টায় যেমন ক'রে পারে ভাবকে ব্যক্ত করেচে, সাহিত্যের আদর্শ থেকে বিচার করলে স্থান পাওয়ার যোগ্য সে মোটেই নয়।

যে কবিতাগুলো পড়ব তা একটু কুণ্ঠিতভাবেই শোনাবো, উৎসাহের সঙ্গে নয়। প্রথম দিনেই যা লিখেচি, সেই কবিতাটাই আগে পড়ি। অবশ্য ঠিক প্রথম দিনেরই লেখা কি-না, আমার পক্ষে জোর ক'রে বলা শক্ত। রচনার কাল সম্বন্ধে আমার উপর নির্ভর করা চলে না; আমার কাব্যের ঐতিহাসিক যাঁরা, তাঁরা সে কথা ভালো জানেন। হৃদয় যখন উদ্বেল হ'য়ে উঠেছিল আশ্চর্য্য ভাবোচ্ছ্বাসে, এ হচ্চে তখনকার লেখা। এ'কে এখনকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। আমি বলেচি আমাদের এক দিক 'অহং' আর একটা দিক 'আত্মা'। 'অহং' যেন খণ্ডাকাশ, ঘরের মধ্যকার আকাশ, যা নিয়ে বিষয়কর্ম্ম মামলামকদ্দমা, এই সব। সেই আকাশের সঙ্গে যুক্ত মহাকাশ, তা নিয়ে বৈষয়িকতা নেই; সেই আকাশ অসীম, বিশ্বব্যাপী। বিশ্বব্যাপী আকাশে ও খণ্ডাকাশে যে-ভেদ, অহং আর আত্মার মধ্যেও সেই ভেদ। মানবত্ব বলতে যে-বিরাট

পুরুষ, তিনি আমার খণ্ডাকাশের মধ্যেও আছেন। আমারই মধ্যে দুটো দিক আছে—এক আমাতেই বদ্ধ, আর এক সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুই-ই যুক্ত এবং এই উভয়কে মিলিয়েই আমার পরিপূর্ণ সত্তা। তাই বলেচি, যখন আমরা অহংকে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরি, তখন আমরা মানবধর্ম্ম থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়ি। সেই মহামানব, সেই বিরাটপুরুষ যিনি আমার মধ্যে রয়েচেন, তাঁর সঙ্গে তখন ঘটে বিচ্ছেদ।

"জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে র'য়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি র'য়েছি বাঁধা।
র'য়েছি মগন হ'য়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ পরে!"

এইটেই হচ্চে অহং, আপনাতে আবদ্ধ, অসীম থেকে বিচ্যুত হ'য়ে অন্ধ হ'য়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে। তারই মধ্যে ছিলুম, এটা অনুভব করলুম। সে যেন একটা স্বপ্নদশা।

"গভীর—গভীর গুহা, গভীর আঁধার ঘোর,
গভীর ঘুমন্ত প্রাণ একেলা গাহিছে গান,
মিশিছে স্বপন-গীতি বিজন হৃদয়ে মোর।"

নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নের যে লীলা, সত্যের যোগ নেই তার-

সঙ্গে। অমূলক, মিথ্যা নানা নাম দিই তাকে। অহং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ যে জীবন, সেটা মিথ্যা। নানা অতিকৃতি দুঃখ ক্ষতি সব জড়িয়ে আছে তাতে। অহং যখন জেগে উঠে আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে নূতন জীবন লাভ করে। এক সময়ে সেই অহং-এর খেলাঘরের মধ্যে বন্দী ছিলুম। এমনি ক'রে নিজের কাছে নিজের প্রাণ নিয়েই ছিলুম, বৃহৎ সত্যের রূপ দেখিনি।

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান!
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ!
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।"

এটা হচ্ছে সেদিনকার কথা, যেদিন অন্ধকার থেকে আলো এল বাইরের, অসীমের। সেদিন চেতনা নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমার মধ্যে প্রবেশ করল। সেদিন

কারার দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়বার জন্যে, জীবনের সকল বিচিত্র লীলার সঙ্গে যোগযুক্ত হ'য়ে প্রবাহিত হবার জন্যে অন্তরের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা। সেই প্রবাহের গতি মহান বিরাট সমুদ্রের দিকে। তাকেই এখন বলেচি বিরাটপুরুষ। সেই যে মহামানব, তারই মধ্যে গিয়ে নদী মিলবে, কিন্তু সকলের মধ্যে দিয়ে। এই যে-ডাক পড়ল, সূর্য্যের আলোতে জেগে মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠল, এ আহ্বান কোথা থেকে? এর আকর্ষণ মহাসমুদ্রের দিকে, সমস্ত মানবের ভিতর দিয়ে, সংসারের ভিতর দিয়ে, ভোগ ত্যাগ কিছুই অস্বীকার ক'রে নয়, সমস্ত স্পর্শ নিয়ে শেষে পড়ে এক জায়গায় যেখানে—

> "কি জানি কি হ'ল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
> দূর হ'তে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
> সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়,
> তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়।"

সেখানে যাওয়ার একটা ব্যাকুলতা অন্তরে জেগেছিল। 'মানবধর্ম্ম' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেচি, সংক্ষেপে এই তার ভূমিকা। এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েচি মহা-মানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নিয়ে তিনি সর্ব্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক।

এর দু-চার দিন পরেই লিখেচি 'প্রভাত উৎসব'। একই কথা, আর একটু স্পষ্ট ক'রে লেখা—

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'!
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত,
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।"

এই তো সমস্তই মানুষের হৃদয়ের তরঙ্গলীলা। মানুষের মধ্যে স্নেহ প্রেম ভক্তির যে সম্বন্ধ সেটা তো আছেই। তাকে বিশেষ ক'রে দেখা, বড় ভূমিকার মধ্যে দেখা, যার মধ্যে সে তার একটা ঐক্য, একটা তাৎপর্য্য লাভ করে। সেদিন যে-দু-জন মুটের কথা বলেচি, তাদের মধ্যে যে আনন্দ দেখলুম, সে সখ্যের আনন্দ, অর্থাৎ এমন-কিছু যার উৎস সর্ব্বজনীন সর্ব্বকালীন চিত্তের গভীরে। সেইটে দেখেই খুসি হয়েছিলুম। আরো খুসি হয়েছিলুম এই জন্যে যে, যাদের মধ্যে ঐ আনন্দটা দেখলুম, তাদের বরাবর চোখে পড়ে না, তাদের অকিঞ্চিৎকর ব'লেই দেখে এসেচি। যে-মুহূর্ত্তে তাদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রকাশ দেখলুম, অমনি পরম সৌন্দর্য্যকে অনুভব করলুম। মানব সম্বন্ধের যে বিচিত্র রসলীলা, আনন্দ, অনির্ব্বচনীয়তা, তা দেখলুম সেইদিন। সে দেখা বালকের কাঁচা লেখায় আকুবাঁকু ক'রে নিজেকে

প্রকাশ করেচে কোনো রকমে, পরিস্ফুট হয়নি। সে সময়ে আভাসে যা অনুভব করেচি, তাই লিখেচি। আমি যে যা-খুসি গেয়েচি, তা নয়। এ গান দু-দণ্ডের নয়, এর অবসান নেই। এর একটা ধারাবাহিকতা আছে, এর অনুবৃত্তি আছে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। আমার গানের সঙ্গে সকল মানুষের যোগ আছে। গান থামলেও সে যোগ ছিন্ন হয় না।

"কাল গান ফুরাইবে, তা ব'লে গাবে না কেন,
আজ যবে হয়েচে প্রভাত।"

"কিসের হরষ-কোলাহল,
শুধাই তোদের, তোরা বল!
আনন্দ-মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে,
আনন্দে হ'তেছে কভু লীন,
চাহিয়া ধরণী পানে নব আনন্দের গানে
মনে পড়ে আর একদিন।"

এই যে বিরাট আনন্দের মধ্যে সব তরঙ্গিত হচ্চে, তা দেখিনি বহুদিন, সেদিন দেখলুম। মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে একটি আনন্দের রস আছে। সকলের মধ্যে এই যে আনন্দের রস, তাকে নিয়ে মহারসের প্রকাশ। "রসো বৈ সঃ।" রসের খণ্ড খণ্ড প্রকাশের

মধ্যে তাকে পাওয়া গিয়েছিল। সেই অনুভূতিকে প্রকাশের জন্যে মরীয়া হ'য়ে উঠেছিলুম, কিন্তু ভালো রকম প্রকাশ করতে পারিনি। যা বলেচি অসম্পূর্ণ-ভাবে বলেচি।

প্রভাতসঙ্গীতের শেষের কবিতা—

"আজ আমি কথা কহিব না।
আর আমি গান গাহিব না।
হের আজি ভোর-বেলা এসেছে রে মেলা লোক,
ঘিরে আছে চারিদিকে
চেয়ে আছে অনিমিখে,
হেরে মোর হাসি-মুখ ভুলে গেছে দুখ-শোক।
আজ আমি গান গাহিব না।"

এর থেকে বুঝতে পারা যাবে, মন তখন কীভাবে আবিষ্ট হয়েছিল, কোন্ সত্যকে মন স্পর্শ করেছিল। যা-কিছু হচ্চে, সেই মহামানবে মিলচে, আবার ফিরেও আসচে সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নানা রসে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হ'য়ে। এটা উপলব্ধি হয়েছিল অনুভূতিরূপে, তত্ত্বরূপে নয়। সে সময় বালকের মন এই অনুভূতি দ্বারা যেভাবে আন্দোলিত হয়েছিল, তারই অসম্পূর্ণ প্রকাশ প্রভাতসঙ্গীতের মধ্যে। সেদিন অক্সফোর্ডে যা

বলেচি, তা চিন্তা ক'রে বলা। অনুভূতি থেকে উদ্ধার ক'রে অন্য তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে যুক্তির উপর খাড়া ক'রে সেটা বলা। কিন্তু তার আরম্ভ ছিল এখানে। তখন স্পষ্ট দেখেচি, জগতের তুচ্ছতার আবরণ খ'সে গিয়ে সত্য অপরূপ সৌন্দর্য্যে দেখা দিয়েচে। তার মধ্যে তর্কের কিছু নেই, সেই দেখাকে তখন সত্যরূপে জেনেচি। এখনো বাসনা আছে, হয়ত সমস্ত বিশ্বের আনন্দরূপকে কোনো এক শুভ মুহূর্ত্তে আবার তেমনি পরিপূর্ণভাবে কখনও দেখতে পাব। এইটে যে একদিন বাল্যাবস্থায় সুস্পষ্ট দেখেছিলুম, সেইজন্যেই "আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি" উপনিষদের এই বাণী আমার মুখে বার-বার ধ্বনিত হয়েচে। সেদিন দেখেছিলুম, বিশ্ব স্থূল নয়, বিশ্বে এমন কোনো বস্তু নেই যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই। যা প্রত্যক্ষ দেখেচি তা নিয়ে তর্ক কেন? স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময় যে সত্তা, তার মৃত্যু নেই।

৩

বর্ষার সময় খালটা থাকত জলে পূর্ণ। শুকনোর দিনে লোক চলত তার উপর দিয়ে। এ পারে ছিল একটা হাট, সেখানে বিচিত্র জনতা। দোতলার ঘর

থেকে লোকালয়ের লীলা দেখতে ভালো লাগত। পদ্মায় আমার জীবনযাত্রা ছিল জনতা থেকে দূরে। নদীর চর—ধূ-ধূ বালি, স্থানে স্থানে জলকুণ্ড ঘিরে জলচর পাখী। সেখানে যে-সব ছোট গল্প লিখেচি তার মধ্যে আছে পদ্মাতীরের আভাস। সাজাদপুরে যখন আসতুম চোখে পড়ত গ্রাম্য জীবনের চিত্র, পল্লীর বিচিত্র কর্ম্মোদ্যম। তারই প্রকাশ 'পোষ্টমাষ্টার' 'সমাপ্তি' 'ছুটি' প্রভৃতি গল্পে। তাতে লোকালয়ের খণ্ড খণ্ড চলতি দৃশ্যগুলি কল্পনার দ্বারা ভরাট করা হয়েচে।

সেই সময়কার এক দিনের কথা মনে আছে। ছোট শুকনো পুরানো খালে জল এসেচে। পাঁকের মধ্যে ডিঙিগুলো ছিল অর্দ্ধেক ডোবানো, জল আসতে তাদের ভাসিয়ে তোলা হ'ল। ছেলেগুলো নতুন জলধারার ডাক শুনে মেতে উঠেচে। তারা দিনের মধ্যে দশবার ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়চে জলে।

দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে সে দিন দেখছিলুম, সামনের আকাশে নববর্ষার জলভারনত মেঘ, নীচে ছেলেদের মধ্যে দিয়ে প্রাণের তরঙ্গিত কল্লোল। আমার মন সহসা আপন খোলা দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে সুদূরে। অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল, সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী একটি সর্ব্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র

লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড লীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করচি, যা ভোগ করচি, চার দিকে ঘরে ঘরে জনে জনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যা-কিছু উপলব্ধি চলেচে, সমস্ত এক হয়েচে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে। অভিনয় চলেচে নানা নটকে নিয়ে, সুখদুঃখের নানা খণ্ডপ্রকাশ চলচে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবযাত্রায়, কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্চে এক পরম দ্রষ্টার মধ্যে যিনি সর্ব্বানুভূঃ। এত কাল নিজের জীবনে সুখদুঃখের যে-সব অনুভূতি একান্ত-ভাবে আমাকে বিচলিত করেচে, তাকে দেখতে পেলুম দ্রষ্টারূপে এক নিত্য সাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে।

এমনি ক'রে আপনা থেকে বিবিক্ত হয়ে সমগ্রের মধ্যে খণ্ডকে স্থাপন করবামাত্র নিজের অস্তিত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল। তখন জীবনলীলাকে রসরূপে দেখা গেল কোনো রসিকের সঙ্গে এক হয়ে। আমার সে দিনকার এই বোধটি নিজের কাছে গভীরভাবে আশ্চর্য্য হয়ে ঠেকল।

একটা মুক্তির আনন্দ পেলুম। স্নানের ঘরে যাবার পথে একবার জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম ক্ষণকাল অবসর যাপনের কৌতুকে। সেই ক্ষণকাল এক মুহূর্ত্তে আমার সামনে বৃহৎ হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে জল পড়চে তখন, ইচ্ছে করচে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ক'রে ভূমিষ্ঠ

হয়ে প্রণাম করি কাউকে। কে সেই আমার পরম অন্তরঙ্গ সঙ্গী যিনি আমার সমস্ত ক্ষণিককে গ্রহণ করচেন তাঁর নিত্যে। তখনি মনে হ'ল আমার একদিক থেকে বেরিয়ে এসে আর একদিকের পরিচয় পাওয়া গেল। এষোঽস্য পরম আনন্দঃ, আমার মধ্যে এ এবং সে,—এই এ যখন সেই সে-র দিকে এসে দাঁড়ায় তখন তার আনন্দ।

সে দিন হটাৎ অত্যন্ত নিকটে জেনেছিলুম আপন সত্তার মধ্যে দুটি উপলব্ধির দিক আছে। এক, যাকে বলি আমি, আর তারি সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে যা-কিছু, যেমন আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধন জন মান, এই যা-কিছু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি ভাবনা-চিন্তা। কিন্তু পরমপুরুষ আছেন সেই সমস্তকে অধিকার ক'রে এবং অতিক্রম ক'রে,—নাটকের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা যেমন আছে নাটকের সমস্তটাকে নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে। সত্তার এই দুই দিককে সব সময়ে মিলিয়ে অনুভব করতে পারিনে। একলা আপনাকে বিরাট থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সুখে দুঃখে আন্দোলিত হই। তার মাত্রা থাকে না, তার বৃহৎ সামঞ্জস্য দেখিনে। কোনো এক সময়ে সহসা দৃষ্টি ফেরে তার দিকে, মুক্তির স্বাদ পাই তখন। যখন অহং আপন ঐকান্তিকতা ভোলে তখন দেখে সত্যকে।

আমার এই অনুভূতি কবিতাতে প্রকাশ পেয়েচে জীবন-দেবতা শ্রেণীর কাব্যে।

"ওগো অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।"

আমি যে-পরিমাণে পূর্ণ অর্থাৎ বিশ্বভূমীন, সেই পরিমাণে আপন করেচি তাঁকে, ঐক্য হয়েচে তাঁর সঙ্গে। সেই কথা মনে ক'রে বলেছিলুম, তুমি কি খুসি হয়েচ আমার মধ্যে তোমার লীলার প্রকাশ দেখে?

বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেচে মনের মানুষ। এই মনের মানুষ, এই সর্ব্বমানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেচি Religion of Man বক্তৃতাগুলিতে। সেগুলিকে দর্শনের কোঠায় ফেললে ভুল হবে। তাকে মতবাদের একটা আকার দিতে হয়েচে, কিন্তু বস্তুত সে কবিচিত্তের একটা অভিজ্ঞতা। এই আন্তরিক অভিজ্ঞতা অনেক কাল থেকে ভিতরে ভিতরে আমার মধ্যে প্রবাহিত—তাকে

আমার ব্যক্তিগত চিত্তপ্রকৃতির একটা বিশেষত্ব বললে তাই আমাকে মেনে নিতে হবে।

যিনি সর্ব্বজগদ্‌গত ভূমা তাঁকে উপলব্ধি করবার সাধনায় এমন উপদেশ পাওয়া যায় যে, লোকালয় ত্যাগ করো, গুহাগহ্বরে যাও, নিজের সত্তাসীমাকে বিলুপ্ত ক'রে অসীমে অন্তর্হিত হও। এই সাধনা সম্বন্ধে কোনো কথা বলবার অধিকার আমার নেই। অন্তত আমার মন যে-সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্চে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না ক'রে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে,—তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন তবে সে-কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা, আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জ্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনোই ছাড়াতে পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা। তাঁর বাইরে অন্য কিছু থাকা-না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে

বিলুপ্ত ক'রে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন ?

একসময় ব'সে ব'সে প্রাচীন মন্ত্রগুলিকে নিয়ে ঐ আত্মবিলয়ের ভাবেই ধ্যান করেছিলুম। পালাবার ইচ্ছে করেচি, শান্তি পাইনি তা নয়। বিক্ষোভের থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। এভাবে দুঃখের সময় সান্ত্বনা পেয়েচি। প্রলোভনের হাত থেকে এমনিভাবে উদ্ধার পেয়েচি। আবার এমন একদিন এল যেদিন সমস্তকে স্বীকার করলুম, সবকে গ্রহণ করলুম। দেখলুম—মানব-নাট্যমঞ্চের মাঝখানে যে-লীলা তার অংশের অংশ আমি। সব জড়িয়ে দেখলুম সকলকে। এই যে দেখা একে ছোট বলব না। এও সত্য। জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক ক'রে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।